প্রকাশ করেছেন—
শ্রীঅরুণচন্দ্র মজুমদার
দেব সাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড
২১, ঝামাপুকুর লেন,
কলিকাতা-৯

প্রথম মুদ্রণ
ফেব্রুয়ারী
১৯৪৬

ছেপেছেন—
বি. সি. মজুমদার
দেব প্রেস
২১, ঝামাপুকুর লেন
কলিকাতা-৯

উপহার

লেখক-পরিচিতি

গরিব চাষীর ঘরে জন্ম, ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা অগষ্ট তারিখে। নরওয়ের নোর্ডল্যান্ড অঞ্চলে একটা গন্ডগ্রামে, লোং তার নাম। সেই শিশুই সারা পৃথিবীতে সুখ্যাত হলেন একদিন, বিশ্বসাহিত্যের অন্যতম দিকপাল স্রষ্টা, উপন্যাসে, নাটকে, কাব্যে সব্যসাচী, ত্রিমুকুটধারী মহামনীষী বলে। ন্যুট হ্যামসুন তাঁর নাম। চিরতুষারের দেশ উত্তর নরওয়ে, শৈশবে কৈশোরে ইস্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় সেখানে চোখে দেখেন নি ন্যুট, শিক্ষা বলতে যা-কিছু, তা তাঁকে অর্জন করতে হয়েছিল নিজেরই অধ্যবসায় আর সাধনায়। কিন্তু প্রতিভা ছিল তাঁর সহজাত, মজ্জাগত। সেই প্রতিভাই তাঁকে প্রেরণা যুগিয়েছিল সাহিত্যের মাধ্যমে অনবদ্য সৌন্দর্য সৃষ্টির। ভাষা তাঁর হাতে পড়লে ঝলমলিয়ে উঠত সোনার মত।

ন্যুট হ্যামসুনের যে-কোন বই, 'সমালোচনা করব' বলে পড়তে বসলেই সমালোচক এমন ভাবে ডুবে, তলিয়ে যাবেন তার ভিতরে যে উৎকর্ষ বিচারে তার সঠিক মূল্যায়ন করা সাধ্যের বাইরেই চলে যাবে তাঁর। "হাঙ্গার"! হ্যামসুনের হাঙ্গার যেদিন ছেপে বেরুলো, সারা পৃথিবীতে সুধীসমাজের চোখে চমক লাগল একটা। নরওয়ের এই লেখক, নরওয়ের নিশীথ-সূর্যেরই মত এক বিশিষ্ট নিজস্ব দ্যুতিরই অধিকারী। অন্য কারও সংগে তাঁর তুলনা করাই চলে না। জার্মানির অন্যতম শীর্ষস্থানীয় সাহিত্যিক টমাস মান বলেছেন—"তরুণ বয়সে হ্যামসুনের লেখার দ্বারা কীভাবে যে আমি প্রভাবিত হয়েছিলাম, তা বলে বোঝাতে পারব না।"

হ্যামসুন মানুষ ছিলেন লাজুক, প্রচার বিমুখ। সংগ ভালবাসতেন শিশুদেরই শুধু। মানবচরিত্রের শ্রেষ্ঠগুণ বলে বিবেচনা করতেন ন্যায়নিষ্ঠা আর সমদর্শিতাকে। রূপে রসে উজ্জ্বল মধুর হয়ে যেসব ছবি তাঁর লেখনী থেকে ফুটে বেরিয়েছে তাঁর প্রতি বইয়ের পাতায় পাতায়, তা প্রায় সবই তাঁর কৈশোর যৌবনের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা প্রসূত। "ভ্যাগাবন্ডস্" বইখানিতে যাদের সুখদুঃখের মর্মস্পর্শী কাহিনী লিপিবদ্ধ হয়েছে, তারা সভ্যজগৎ থেকে একান্তে বর্ধিত এক সরল অর্ধবন্য মানবগোষ্ঠী। হ্যামসুনের বইগুলি অনূদিত হয়েছে অন্যূন পঁচিশটি সুসমৃদ্ধ ভাষায়।

১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে সাহিত্যের নোবেল প্রাইজ লাভ করেন হ্যামসুন। তাঁর মৃত্যু হয় নরওয়ের গ্রিমস্টাড গ্রামে, তাঁর নিজেরই গৃহে, বিরানব্বুই বৎসর বয়সে।

উত্তরের ঐ গাঁ-খানা থেকেই এলো লোক দু'টো। কাল্‌চে রং গায়ের, পাতলা পাতলা দাড়িতে পাক ধরেছে দু'জনেরই। একজনের পিঠে হাতে-বাজানো অর্গান একটা।

গাঁয়ের মাঝামাঝি একটু ফাঁকা জায়গা বেছে নিয়ে অর্গ্যানটা সেখানেই ওরা রাখল, একটা খোঁটার উপরে। সঙ্গে সঙ্গে বাজনা শুরু।

ছোট্ট জায়গা এই পল্‌ডেন, তাতে সোমত্ত জোয়ান যারা, তারা সবাই চলে গিয়েছে লফোটেন, মাছ ধরতে। বাড়ীতে বাড়ীতে প'ড়ে আছে শুধু বুড়োরা, বাচ্চারা আর বৌরা। একঘেয়ে দিনগুলো ওদের ঝিমিয়ে ঝিমিয়েই কাটে। আজ সকালে হঠাৎ এই পরদেশী দু'টোর আবির্ভাব, আর এসেই, বলা-নেই কওয়া-নেই, খোশ-খেয়ালে বাজনা শুরু ক'রে দেওয়া, সারা গাঁয়ে একটা হৈ-হৈ প'ড়ে গেল একেবারে। যাবতীয় লোক বেরিয়ে এলো ঘর থেকে, ঘিরে দাঁড়াল বাজনা-ওয়ালাদের।

হাতল ঘোরাচ্ছে ঐ যে লোকটা, ও কি কানা নাকি? অন্য লোকটা কিছুই করছে না, একটা থলে হাতে ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। নিজের পায়ের ছেঁড়া জুতো জোড়াই যেন নিরীক্ষণ করছে একমনে।

হঠাৎ কিন্তু সে টুপিটা তুলে নিল মাথা থেকে, আর সেটা উল্‌টো ক'রে ধ'রে চক্কোর দিতে লাগল শ্রোতাদের সামনে। মৌন মিনতি, দাও, দাও, কিছু দাও গরিবদের!

হায় রে, কার কী আছে দেবার মত? এই অজ-পাড়াগাঁ জায়গা, শীতের এই কয়টা মাস তো এটা মরার দেশ বললেই হয়। যে-কোন বাড়ীতে যাও, একটা বৌ, এক জোড়া বুড়োবুড়ী আর দু'টো পাঁচটা কাচ্চাবাচ্চা। কোন রোজগার নেই, কোন গতিকে প্রাণ কয়টা তারা

আটকে রাখতে চায় এই কয়টা মাস। এই কয়টা মাস! যাবৎ বসন্ত ঋতু না আসে ফিরে!

বসন্ত আসবে যেদিন, লফোটেন থেকে নৌকা বোঝাই হয়ে জেলের দল ফিরবে পল্‌ডেনে। সারা শীতকাল সমুদ্রে মাছ ধরেছে তারা। ধ'রেই বিক্রি ক'রে দিয়েছে ব্যাপারীদের কাছে, সারা বছর দিন গুজরান করার মত অর্থ কোমরে বেঁধে ঘরে ফিরবে তারা, সেদিন তাদের মেজাজ থাকবে দিলদরিয়া। আসুক না ঐ বাজনাওয়ালারা সেইদিন, ওদের ঐ ছেঁড়া টুপি পল্‌ডেনবাসীরা ভ'রে দেবে কুচো পয়সায়। আজ? ভাঁড়ে মা-ভবানী।

এ্যান-মেরায়া, ক্যারোলাসের বৌ, এ-গাঁয়ে ওদেরই অবস্থা যাহোক একটু ভাল। তার লজ্জা করছে। গাঁয়ে এসে বাজনা শুনিয়ে গেল পরদেশী দু'টো গরিব। একটা কুচো পয়সাও পাবে না তারা? সে নিজের বাড়ীর দিকে ফিরল, দেখবে খুঁজে, যাহোক কিছু পায় কিনা এদের দেবার মত।

এ্যান-মেরায়া চ'লে যাচ্ছে, বাজনাদারের সঙ্গী লোকটা, টুপি হাতে নিয়ে নিয়ে যে এতক্ষণ বৃথাই ঘুরেছে রেস্তহীন শ্রোতাদের সামনে, সে দেখল তাকে যেতে। সে ভুল বুঝল। ভাবল যে ঐ বৌটা স'রে পড়ল পয়সা দেবার ভয়ে। এইবারে অন্য সকলেও যাবে নিশ্চয়ই। তবে কেন আর মিছে মেহনত করা এই লক্ষ্মীছাড়া গাঁয়ে? সে চড়া গলায় কী যেন বলল তার সাথীকে। তার ভাষাটা অজানা, কিন্তু পল্‌ডেনবাসীরা তার কথার ভাবটা ঠিকই বুঝল। লোকটা বিষম রেগে গিয়েছে, এ-হতচ্ছাড়া গ্রামে সে আর বাজনা শোনাতে চায় না হাড়-কিপ্‌টে গেরস্তদের, অর্গান তুলে নিয়ে অন্য গাঁয়ে যাবে তারা এক্ষুণি। সাথীকে সে হুকুম করছে—"চ'লে আয় এক্ষুণি! চ'লে আয়!" যে বাজাচ্ছে—লোকটার এক চোখ সত্যিই কানা মনে হচ্ছে—

সে-লোকটা কিন্তু বাজিয়েই চলেছে, বাজিয়েই চলেছে। সুরের নেশায় যেন মাতাল হয়ে উঠেছে লোকটা। বাজায়ও সুন্দর। সুন্দর বাজায়। মনপ্রাণ ঢেলেই বাজাচ্ছে, কেড়েও নিচ্ছে মনপ্রাণ।

একটা গৎ শেষ ক'রে সে নতুন একটা গৎ শুরু করল।

তার সাথীর রাগ একটুও কমে নি। সে এই দুই-এক মিনিট সময় দিয়েছে বাজনাওয়ালাকে। হাতের গৎটা শেষ করার সময় দিয়েছে। তা বলে নতুন আর একটা গৎ আবার? কিসের তরে শুনি? যারা পয়সা দেবে না, তাদের বাজনা শোনাবার গরজটা কী? তারা কি বাজনার দানছত্র খুলে বসবার জন্য পল্‌ডেনে এসেছে? রেগে সে আগুন হয়ে গেল একদম।

আগুন হয়ে গেল। লাফিয়ে এসে পড়ল বাজনাওয়ালার উপরে। মাথায় চাঁটির পরে চাঁটি মারতে লাগল চড়বড় চড়বড় ক'রে। বাজনা-ওয়ালার খুবই মুস্কিল। অর্গান ছেড়ে দিয়ে সে ছুটে পালাতে পারে না। এমন কি, অর্গান থেকে হাত তুলতে পর্যন্ত পারে না, মাথাটা বাঁচাবার জন্য। কারণ যন্ত্রটা বসানো রয়েছে স্রেফ একটা খোঁটার মাথায়। বলতে গেলে বাজনাওয়ালার হাতের চাপেই তা দাঁড়িয়ে আছে সোজা হয়ে। সেই হাত যে-মুহূর্তে সরিয়ে নেবে ও, অর্গান ভূমিসাৎ হবে সঙ্গে সঙ্গে, গুঁড়িয়েই যাবে খুব সম্ভব। সুতরাং মাথাটা, যতখানি পারা যায়, নীচু করা ছাড়া তার আর করার কিছু নেই। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মারই খেয়ে যাচ্ছে বেচারী।

ততক্ষণে শ্রোতার দল থেকে জোর প্রতিবাদ শুরু হয়েছে। মেয়েরা চ্যাঁচাচ্ছে, ছেলেরা তড়পাচ্ছে, বুড়ো-বুড়ীরা ভগবানের নাম ক'রে শান্ত হতে বলছে বদরাগী মানুষটাকে। অবশেষে পিছিয়ে এলোও সে। আর এলো যখন, শ্রোতারা দেখে শিউরে উঠল যে তার বাঁ-হাতে রয়েছে একখানা খোলা ছুরি। হোক ছোট্ট ছুরি, যথেষ্ট ধারালো, তাতে সন্দেহ নেই। সকালবেলার রোদ্দুর কী ভাবে তা থেকে ঠিকরে পড়ছে, দেখ না!

ছুরি? লোকটা ছুরি নিয়ে চড়াও হয়েছিল সাথীর উপরে? গুণ্ডা ও? না, রাক্ষস? অকারণে—?

ছুরি থেকে বাজনাওয়ালার দিকে শ্রোতারা চোখ ফিরিয়েছে এইবার। কী সর্বনাশ! ওর চোখের পাশ থেকে গালের উপর পর্যন্ত

যে একটা রক্তের ধারা! এক চোখ তো আগে থেকেই কানা এই অভাগার। বাকী চোখটাও কি কানা করবার তালে ছিল না কি এই রাক্ষস? মা-রো! মারো ওকে!

কিন্তু কে ওকে মারে? দশাসই লম্বা চওড়া পুরুষ ও। বাজনা-ওয়ালার মত শীর্ণ দুর্বল প্যাকাটি-মার্কা লোক নয়। গাঁয়ে তো সমর্থ জোয়ান একটাও নেই! থাকলে এতক্ষণ ওকে পিটিয়ে লাশ বানিয়ে দিত না?

না, সমর্থ জোয়ান সত্যিই নেই। ছেলেরা যারা আছে, বারো-তেরোর বেশী বয়স তাদের কারও নয়।

তবু কিন্তু সেই তেরো-বছরেরই একটা ছেলে তেড়ে এলো আততায়ীকে। সে-লোকটা সাথীর গায়ে ছুরি চালাতে ভয় পায় নি। কিন্তু বিদেশে এসে একশোটা মানুষের সামনে গ্রামেরই একটা ছেলের উপরে ছুরি চালাতে ভয় পেলো বোধ হয়। ছুরি পকেটে ফেলে ঘুষি বাগিয়ে দাঁড়ালো, মুখে অসীম তাচ্ছিল্যের হাসি ফুটিয়ে।

এই তেরো বছরের ছেলেটা হ'ল এডভার্ট। এডভার্ট এ্যান্‌ড্রিয়াসেন। খুবই ডানপিটে ছেলে, বয়সের আন্দাজে যথেষ্ট বলবান ছেলে, আর সবচেয়ে বড় কথা, সাহস ওর দুর্জয়। ও ছুটে এলো সমুখ থেকে, কিন্তু আততায়ীর খুব কাছে এসেই বোঁ-ক'রে ঘুরে গেল এক পাশে, আর সেই পাশ থেকে ল্যাং মারল দুশমনকে। প্রথম ল্যাংটা কোন মতে এড়িয়ে গেল বটে আততায়ী, কিন্তু দ্বিতীয় ল্যাং থেকে আর পারল না আত্মরক্ষা করতে, মাটিতে প'ড়ে গেল দড়াম ক'রে।

এডভার্টের মা ওদিক থেকে তারস্বরে চীৎকার করছেন—"ওরে এডলি, চ'লে আয়, স'রে আয় শীগ্‌গির! চল্‌ বাড়ী, তোকে মারামারি করতে কে বলেছে? চ'লে আয়! চ'লে আয়!"

এডভার্টের মা নিতান্ত বুড়ী অবশ্য নন। কিন্তু চিররুগ্না মানুষ, স্বভাবেও নিরীহ। এডভার্ট ভাল তাঁকে কম বাসে না অবশ্য, কিন্তু

ভয় করে না কোনদিনই। কাজে কাজেই মা ওদিকে চ্যাচাতে থাকুন, সে এদিকে দুশমনের সমুখে দাঁড়িয়েই আছে বুক ফুলিয়ে।

দুশমন? সে গা-ঝাড়া দিয়ে উঠল, এডভার্ট-এর দিকে দৃক্‌পাতও করল না একটিবারও। কোনদিকেই করল না দৃক্‌পাত, সোজা পথ বেয়ে চ'লে গেল গ্রামের বাইরে, অরণ্যের দিকে।

বাজনাওয়ালা ততক্ষণে বাজাতে শুরু করেছে আবার। চোখের কোণ থেকে রক্ত যে চুইয়ে নামছে তার, তা যেন খেয়ালই নেই তার। সেদিকে বৌয়েরাই কেউ-কেউ তাকে সচেতন করে দিল—"রক্তটা মুছে ফ্যালো গো ভাল-মানুষের ছেলে, জখমটা তো সামান্য ব'লে মনে হচ্ছে না খুব।"

উহুঁঃ, গৎটা শেষ না ক'রে জখম-টখমের কথা ভাবতেই রাজী নয় লোকটা। এ্যান-মেরায়া এদিকে ফিরে এসেছে, সত্যিই হাতে ক'রে এনেছে একটা সেণ্টমুদ্রা। বাজনাওয়ালা হাসি-হাসি লাজুক মুখে গালের রক্তটা নোংরা রুমাল দিয়ে মুছে ফেলার চেষ্টা করছে এক হাতে, অন্য হাতে টুপিটা বাড়িয়ে দিয়েছে এ্যান-মেরায়ার দিকে।

এবারে তো তার বিদায় নেবার কথা! মারুক ধরুক, তার সাথীর সঙ্গে চিরজীবনের মত একটা ছাড়াছাড়ি নিশ্চয়ই হয়ে যায় নি আজই! যাবে নিশ্চয়ই, অর্গান বন্ধ ক'রে এইবার তুলবে পিঠে।

কিন্তু তা তো নয়। লোকটা এ আবার করছে কী?

তার অর্গানটা শুধু অর্গান নয়। অর্গানের পাশে একটা বোতাম, সেইটে টিপে ধরতেই ওদিক থেকে একটা ঢাকনা স্ল্যাট ক'রে স'রে গেল। আর তার ভিতর থেকে বেরিয়ে পড়ল থিয়েটার-মঞ্চেরই দৃশ্যের মত জমকালো দৃশ্য একটা। একটা উপত্যকায় অনেক সৈন্য, কেউ ঘোড়ায়, কেউ পায়দলে। পিছন পানে একটা পাহাড়ের মাথায় জনা তিনেক লোক, তাদের গায়ে ঝলমল করছে নানা রংয়ের সামরিক পোশাক। মাঝের লোকটা যে, বেঁটে মোটা, দূরবীন যার হাতে, তাকে দেখেই—

হোক না তারা উত্তর নরওয়ের অধিবাসী, ফরাসী-জার্মান মুলুক

থেকে অনেক দূরের লোক, তা ব'লে ও-চেহারা কি আর ভুল করতে পারে তারা? "নেপোলিয়ঁা! নেপোলিয়ঁা।"—ব'লে বুড়োরা বৌয়েরা সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠল একেবারে। শিশুরা সঙ্গে সঙ্গে কলরব ক'রে উঠল, কিছু না বুঝেও।

নেপোলিয়ঁার দুই পাশে দুই মার্শাল সেনাপতি তাঁর। তাদের পরিচয় পল্‌ডেনবাসীদের ঠিক জানা নেই, বিদেশী ধরনের দুষ্ট উচ্চারণে নরওয়ের চল্‌তি ভাষাতেই বাজনাওয়ালা ব'লে দিল, "নে আর মেসানা।" তারপর সে একটা দড়ি ধ'রে টানল, আর সঙ্গে সঙ্গে পটপরিবর্তন হ'ল। নতুন ছবি দেখা দিল বল্‌টিক সমুদ্রের। দিগন্তে পাহাড়ের গায়ে পাহাড়, রৌদ্রদীপ্ত নীল জলে জাহাজের পরে জাহাজ, সে-দৃশ্যই কি আর কম জমকালো না কি? কিন্তু নাঃ, গ্রামবাসীদের বায়না—"আর একটিবার তোমার নেপোলিয়ঁা দেখাও বাবা, নেপোলিয়ঁা দেখাও—"

ইতিমধ্যে আরও দুই একটি বৌ দুই একটা সেণ্ট এনে দিয়েছে বাজনাওয়ালাকে। এ্যান-মেরায়া এইবার বল্‌ল—"তোমার তো বোধ হয় কিছু খাওয়া হয় নি সকালে? এসো, আমার বাড়ীতে—"

এ্যান-মেরায়ার সঙ্গে বাজনাওয়ালা গিয়ে তার বাড়ীতে রান্নাঘরে ঢুকল। প্রতিবেশীরাও ঢুকল তার সঙ্গে। যতগুলি ধরল, ততগুলি তো ঢুকলই, বাদবাকী সবাই বাইরে দাঁড়িয়ে জানালা দিয়ে দেখতে লাগল তার খাওয়া। সামান্য জিনিস। আলু সিদ্ধ, শুঁটকি হেরিংয়ের ঝোল, আর একবাটি যবের মাড়। তাইতেই কী তৃপ্তি লোকটার। যেন রাজভোগ খাচ্ছে!

খেতে খেতে হাজার প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছে ও। "বাড়ী"—আর্মেনিয়ায়! "সে কোথায়?"—অনেক, অনেক দূরে, অনেক পাহাড়, অনেক নদী, অনেক কিছু পেরিয়ে, যেতে অন্ততঃ এক বচ্ছর লাগবে।

"তোমার সঙ্গে ঐ যে লোকটা, যে মারল তোমায়, কে ও?" —আমার ভাগীদার। দু'জনের পয়সায় কেনা এই অর্গানটা।

লোকটা রাগী, বেপরোয়া। এই যে আমার একটা চোখ কানা, ঐ ওরই কাজ এটা। ছুরি বসিয়ে দিয়েছিল চোখে। চোখ কানা-করার দিকেই ঝোঁক ওর। দেখলে তো? আজও এই চোখেই বসাতে যাচ্ছিল ছুরি। ভাগ্যিস তোমরা সবাই ছিলে!

লোকটা বসেছে টেবিলের প্রান্তে, একখানা পা টেবিলের তলায় আছে, আর একখানা খোলা মেজেতে এসে পড়েছে, ঘরসুদ্ধ লোকের সামনে! পেণ্টুলানটা উঠে গিয়েছে প্রায় হাঁটু পর্যন্ত, বেরিয়ে পড়েছে তার তলা থেকে ছেঁড়া মোজা।

এ্যান-মেরায়া আফশোস ক'রে উঠল—"মোজা আর নেই তোমার?"

"নাঃ, আর নেই"—সোজা হয়ে ব'সে বাজনাওয়ালা পেণ্টুলান নামিয়ে দিল জুতো পর্যন্ত।

"এটা তো ছিঁড়ে গিয়েছে—"

"তা গিয়েছে বটে"—বলল বাজনাওয়ালা—"অনেক জায়গাতেই ফুটো হয়েছে। বড় বড় ফুটো। কী আর করা যাবে? কীরকম মজুরি ওঠে অর্গান বাজিয়ে, নিজেরাই দেখলে তো!"

এ্যান-মেরায়া কথা না বাড়িয়ে উঠে গেল দুই মিনিটের জন্য, ফিরে এলো একজোড়া নতুন পুরু পশমী মোজা হাতে নিয়ে। "এই মোজাটা পর তুমি"—বলল বাজনাওয়ালাকে।

মোজা জোড়াটা এ্যান-মেরায়ার স্বামী কেরোলাসের। সে মাছ ধরতে গিয়েছে লফোটেন।

বাজনাওয়ালা তো হতবাক বটেই, পড়শীরাও তাই। এ যে কল্পনাতীত খয়রাত! কেরোলাস বাড়ীতে থাকলে তার বৌ এমন দরাজ হাতে খয়রাত করতে নিশ্চয়ই সাহস পেতো না। উঃ, কমসে-কম কুড়ি সেণ্ট তো দাম হবেই মোজা জোড়ার!

বাজনাওয়ালা যে কী করবে, ঠিক পায় না। একবার মাথায় তুলছে সেই মোজা, একবার বুকে চেপে ধরছে, আর একবার চুমো খাচ্ছে তার উপরেই। এ্যান-মেরায়া বলল—"পরে ফ্যালো"—

"না, এখন না"—বাজনাওয়ালা বলল গদগদ কণ্ঠে—"বনের ভিতর গিয়ে প্রার্থনা করব একটুখানি। এই দয়া পেলাম যাঁর কাছে, মঙ্গলপ্রার্থনা করব তাঁর। পরব তার পরে—"

একথার উত্তরে আর কে কী বলবে?

বাজনাওয়ালা বিদায় হয়ে গেল। গ্রামের লোক যে-যার কাজে মন দিল, অর্থাৎ কেউ বসল গোল হয়ে গল্প করবার জন্য, কেউ লাঠিগাছটা হাতে নিয়ে যাত্রা করল খাঁড়ির দিকে। কাজ? না, খাঁড়ির দিকে কাজ কিছুই নেই তার, তবে কোন নৌকা যদি দৈবাৎ এসে থাকে ভিন্-জায়গা থেকে, খোঁজখবর নেবে তাদের কাছে, বাইরের দুনিয়াটা চলছে কেমন।

সবাই নিজের নিজের কাজে গেল, এডভার্ট কিন্তু পিছু নিল বাজনাওয়ালার। অকারণে লোকটা মার খেলো তার ভাগীদারের কাছে। সেই নির্মম ভাগীদারের সঙ্গে আবার দেখা হয় কিনা ওর, দেখা হলে কীরকম কথাবার্তা হয় দু'জনে, জানবার জন্য বিষম কৌতূহল হয়েছে এডভার্টের। ব্যাপারটা আগাগোড়াই যেন অস্বাভাবিক, একটু যেন রহস্যাবৃতই লেগেছে তার কাছে।

বাজনাওয়ালা যখন দেখল ওকে পিছনে আসতে, খুশী হ'ল না সে। "তুমি যাচ্ছ কোথায়?"—বেশ বিরক্তভাবেই জানতে চাইল সে।

এডভার্ট বলল—"ঐদিকে একটু কাজ আছে আমার।"

আরও বিরক্ত, আরও অপ্রসন্ন বাজনাওয়ালা। তার সে নিরীহ কাঁচুমাচু ভাব আর নেই যেন। যা হোক, মাঝে মাঝে পিছন ফিরে আগুন-চোখে তাকানো ছাড়া সে আর করতেই বা পারে কী?

বাজনাওয়ালা আগে আগে, এডভার্ট কয়েক গজ পিছনে তার। দু'জনে বনের ভিতর এসে পড়ল। আর তারপরই একটা ঝোপের আড়াল থেকে হাসতে হাসতে বেরিয়ে এলো বাজনাওয়ালার সেই নিষ্ঠুর ভাগীদার। এডভার্টকে দেখেই সে এক ধমক দিল জোর গলায়—"তুই এখানেও এসেছিস পাজি ছোকরা?"

এডভার্ট বলল—"ট্যাঁ-ফু করেছ কি একটা হাঁক দেব আমি, আমার বন্ধুরা পিছনেই আছে।"

ভাগীদার আর ওকে ঘাঁটালো না। বাজনাওয়ালা তখন তার তহবিল বার করে তুলে দিয়েছে ভাগীদারের হাতে. সে সেটা গুনে দেখতে ব্যস্ত। পাঁচ সেণ্ট? তা, মন্দ কী! মোটে এক সেণ্টও যেখানে হবে না বলে মনে হয়েছিল, একটা মারপিটের অভিনয়ের ফলে সেখানে পাঁচ-পাঁচটা সেণ্ট যদি আদায় হয়ে থাকে, সে-অভিনয়কে বাহবা দিতেই হবে।

কিন্তু ভাগীদারকে আহ্লাদে আটখানা ক'রে তুলবার মত জিনিস বাজনাওয়ালার জামার ভিতরে লুকোনো রয়েছে তখনো। সেই যে মোজা-জোড়া! সেটা হাতে পেয়ে সে বত্রিশ দাঁত বের ক'রে ফেললো আনন্দে। তারপর, এডভার্টের দিকে তাকিয়ে ভেংচি কাটল একটা, আর দ্রুত পা চালিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল বনের গভীরে।

কী তোয়াক্কা রাখে ঐ ঠক দু'টো বালক এডভার্টের? এ পথে তো তারা আর আসছে না নিশ্চয়ই!

২

দিনের পরে দিন যায়, বছরের পরে বছর।

এডভার্টের বয়স ষোল হ'ল। লেখাপড়া বিশেষ হ'ল না তার। ওদিকে মাথা নেই তেমন। তবে হ্যাঁ, হিসেবটা সে খুব বোঝে। কাগজ পেন্‌সিলের সাহায্য দরকার হয় না, মনে মনে চটপট সে নির্ভুল হিসেব ক'রে দেবে, ছয় সেণ্ট দৈনিক মজুরি যার, তেরোদিন কাজ করলে তার পাওনা হয় কত।

গির্জাতেই স্কুল আছে পাদরি সাহেবের। তাঁর কাছে শেষ পরীক্ষা দিয়ে যে পাশ না করেছে, সে-ছেলেকে কেউ কোন কাজে নিতে চায় না। এমন কি, জাল ফেলে মাছ ধরার কাজেও না। তাই গাঁ থেকে এখনও বেরুতে পারে নি এডভার্ট, ষোল বছর বয়সেও। পাদরি সাহেব লোক এমন কিছু কড়া নন, তবু এডভার্টকে তিনি পাশ করিয়ে দিতে পারলেন না গত বছর। ফলে, লফোটেন-যাত্রী মেছো-বজরাতে ঠাঁই হ'ল না তার। ওর বাবা ছাপোষা মানুষ। না, চাষী বা জেলে তিনি নন। সরকারী টেলিগ্রাফ লাইনের জিম্মাদার তিনি, এদিকে ওদিকে মিলিয়ে মাইল পঞ্চাশ লম্বা তারগুলো বেশ ভাল অবস্থায় আছে কিনা, তাই দেখাই কাজ তাঁর। মাইনে পান সামান্য, সংসারটা বৃহৎ, চার ছেলে মেয়ে, চিররুগ্না স্ত্রী। কাজেই বড় ছেলে এডভার্ট কিছু কিছু রোজগার ক'রে আনতে পারলে সুবিধেই হয় তাঁর। নিজে সরকারী চাকরি পেয়ে গিয়েছেন বলে ছেলেকে যে তিনি জাত-ব্যবসাতে নামতে নিষেধ করবেন, এমন দেমাক তাঁর নেই। পুরুষানুক্রমে পল্‌ডেনবাসীদের সবাইয়েরই কাজ হ'ল লফোটেনের সমুদ্রে কড মাছ ধরা। পনেরো-ষোল বছর বয়সে ও-কাজে হাতে-খড়ি হয় ছেলেদের, তারপর ওতেই লেগে থাকে, যতদিন দাঁড় ধরবার আর জলে নামাবার শক্তি থাকে দেহে।

তা গত বছরই কেরোলাসের আট দাঁড়ের বজরাতে জায়গা পেতে পারত এডভার্ট। বয়সের আন্দাজে যথেষ্ট তাগড়া তো সে! কিন্তু তা আর হ'ল না, পাদরি সাহেবের জন্য। তিনি পারলেন না ওকে পাশ করিয়ে দিতে। ব'সে ব'সে বাপের অন্ন ধ্বংস করতে লজ্জাই করেছে ওর, এই একটা বছর। মনে মনে মুণ্ডপাত করেছে পাদরির। কেন? তাকে পাশ করিয়ে দিলে ক্ষতিটা হত কী? পাদরি যা পড়ান, আর যার পরীক্ষা নেন, তার সঙ্গে মেছো-বজরার দাঁড়ীগিরি কাজের কোন্ সম্পর্কটা আছে শুনি?

যা হোক, ষোল বছর বয়সে পাশ ক'রে বেরুলো সে। আগের বছরের চেয়ে বিদ্যে যে বিশেষ বেড়েছে তার, তা অবশ্য নয়। কিন্তু বুড়ো এ্যান্‌ড্রিয়াসেনের মুখের দিকে আর যেন চাইতে পারছিলেন না পাদরি। এডভার্টকে পাশ করতে না দেওয়া মানে যে তার বাবাকে আধপেটা খেতে বাধ্য করা, তা তো বোঝেন নি।

তাই তিনি অনুমতি দিলেন এবার, এডভার্ট বসল গিয়ে কেরোলাসের নৌকায়। পুরো চার মাস খাটল লফোটেনের সমুদ্রে। রোজগার তো হ'লই কিছু। তার চেয়েও যা বড় কথা, খোলা দরিয়ায় নৌকো চালাতে শিখল, দাঁড় টানতে, পাল খাটাতে পাল নামাতে, জোয়ার ভাটার টান সামলাতে, আকাশের চেহারা দেখে আবহাওয়ার আসন্ন পরিবর্তন আন্দাজ করতে। চার মাস পরে পল্‌ডেনে সে ফিরল যখন, দস্তুরমত ওয়াকিবহাল নাবিক সে একটা। গোটা-কতক ডলার তার হাত থেকে পেয়ে যত না খুশী হলেন তার বাবা, তার চেয়ে বেশী হলেন লোকমুখে তার দক্ষতার কাহিনী শুনে।

যা হোক, লফোটেন থেকে ফেরার পরে আর হাতে কাজ নেই কিছু। কী ক'রে সময় কাটানো যাবে, ভেবে পাচ্ছে না এডভার্ট। এমন সময় একটা নতুন ছেলে এসে পড়ল পল্‌ডেনে। অগস্ট তার নাম।

নতুন ছেলেটা এ-গাঁয়ে ঠিক নতুন অবশ্য নয়। বাড়ী যদিও

পল্‌ডেনে নয় ওর, শৈশবে ও মানুষ হয়েছিল এ-গাঁয়েরই এক মহিলার কাছে। সম্পর্কে অগস্টের মাসী হন তিনি। এদিকে তাঁরও ত্রিসংসারে কেউ ছিল না, ওদিকে অগস্টও ছিল পিতৃমাতৃহীন।

হ্যাঁ, শৈশবটা এই পল্‌ডেনেই কেটেছিল অগস্টের। কৈশোরেরও প্রথম ভাগটা। তারপর ও একদিন হঠাৎ নিরুদ্দেশ হয়ে গেল। মাসী দুই চারদিন এর-ওর-তার কাছে নিল বটে খোঁজখবর, কিন্তু পাওয়া গেল না অগস্টের কোন খবর। সেই অগস্ট আবার এই ছয় সাত বছর পরে এসে হাজির হয়েছে গ্রামে। এখানে ছাড়া যাওয়ার জায়গা তো নেই ওর কোথাও!

মাসী বেঁচে আছেন। তাঁর কাছেই এসে উঠেছে অগস্ট। রীতিমত যুবক এখন সে, বয়স প্রায় কুড়িরই কাছাকাছি হবে বই কি!

"কোথায় গিয়েছিলে?"—জিজ্ঞাসা করে সবাই।

"কোথায় যাইনি?"—জবাব দেয় অগস্ট। "সাত সমুদ্র চষে বেড়িয়েছি জাহাজে জাহাজে। হেন দেশ নেই, যেখানে পায়ের ধুলো দিই নি। হেন সমুদ্র নেই, যার জলে হাবুডুবু খাই নি। হেন কাজও নেই দুনিয়ায়, যা করি নি অন্ততঃ দু'দিনের তরেও। অবশেষে একবার দেশের জন্য মন কেমন ক'রে উঠল। এলাম চ'লে। তবে থাকব না বেশীদিন। একটা কাজ হাতে এসেছিল। ভাবলাম যে একাজ অন্য জায়গাতেও যেমন করা যায়, আমার পল্‌ডেনে গিয়ে বসেও করা যায় তেমনি। সেই জন্যই অর্থাৎ, কাজটা যেদিন হাঁসিল হবে, সেইদিনই খসে পড়ব আবার।"

"কী কাজ? কী কাজ? আমরাও হাত লাগাতে পারি না কি তাতে?"

"না, বেশী লোকের কাজ নয়। একাই পারব—"

এডভার্টের চেয়ে অন্ততঃ তিন-চার বছরের বড় হবে অগস্ট। কিন্তু এবার পল্‌ডেনে এসে বন্ধু হিসেবে এডভার্টকেই বেছে নিল সে। গাঁয়ের ছেলেদের মধ্যে এডভার্টই লম্বা চওড়া বলিষ্ঠ পুরুষ। তাছাড়া

কথাবার্তাতেও বেশ চটপটে তুখোড়। এই শেষের গুণটা দেখেই ওর দিকে বিশেষ ক'রে আকৃষ্ট হয়েছে অগস্ট, নিজের মুখে তো তার তুবড়িবাজি ফুটছে কিনা অনবরত! গল্প যখন শুরু করে অগস্ট, তখন নিজের ঢাক এমন করে পিটোতে শুরু করে যে আদ্ধেক শ্রোতা বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে থাকে। বাকী আদ্ধেক মনে মনে তাকে গালি দেয় মিথ্যুক ধাপ্পাবাজ বলে। কখনো নিজেকে রাজা-উজির বানাচ্ছে অগস্ট, কখনো জাহির করছে সর্বকর্মে ওস্তাদ সবজান্তা ব'লে।

অগস্টের চেহারায় একটা খুঁত হয়ে গিয়েছে এই কয়েক বছরে। তার উপরের ঠোঁটটা কেটে দু-ফাঁক হয়ে গিয়েছে, প্রায় গন্নাকাটার মত। এক জাহাজে এটা হয়। দারুণ একটা দুর্ঘটনায় পড়েছিল অগস্ট আর অন্য কয়েকটি নাবিক। মারাই গেল দু'জন, একজনের পা ভেঙ্গে রয়েছে সেই থেকে, আর অগস্টের এই যা দেখছ সবাই, কেটে গেল ঠোঁটটা।

দুর্ঘটনাটা যে কী তা কিন্তু অগস্ট কিছুতেই বলে না।

তা তো বলেই না, উপরন্তু খুঁতটা ঢেকে রাখার জন্য তার চেষ্টা অসীম। ঝাড়ালো একজোড়া গোঁফ রেখেছে চেরা-ঠোঁট ঢাকবার জন্য। মাড়ির মাঝ-বরাবর দু'টো পাটি থেকেই দাঁত ভেঙ্গে গিয়েছিল বেশ কয়েকটা। তাদের জায়গায় সোনার দাঁত বসিয়ে নিয়েছে অগস্ট। দেদার পয়সা খরচ করেছে নিশ্চয়।

শুধু দাঁতের জন্যই যে করেছে খরচ, তাও নয়। ওর জুতো জামা সবই দামী দামী জিনিস। পল্‌ডেনের লোক চোখে দেখে নি, এমন এমন সব জিনিস, তার রাজা-উজিরী গল্প, ইচ্ছে করলে অবিশ্বাস করতেও পারে কেউ। কিন্তু চোখে দেখা যাচ্ছে, হাতে সোনার আংটি, বুকে সোনার চেন, পায়ে পেটেন্ট-চামড়ার জুতো অগস্টের, এসব তো আর অবিশ্বাস করা সম্ভব নয়। ভেবে-চিন্তে গ্রামের লোক এই সিদ্ধান্তে পৌঁছোলো যে ছেলেটা মিথ্যাবাদী নিশ্চয়ই, কিন্তু হাতে ওর পয়সা আছে।

পয়সা যে আছে, তার পরিচয় অন্য দিক দিয়েও অগস্ট দিচ্ছে।

নগদ দাম দিয়ে চামড়া কিনছে সে। পল্‌ডেন তো বটেই, পাশাপাশি কয়েকখানা গ্রামে যে-কোন গৃহপালিত জন্তু মরুক, তার চামড়া অগস্ট খবর পেলেই কিনে নেবে। নগদ দামেই নেবে। গোরু, ঘোড়া, শুওর, ভেড়া, ছাগল, গাধা কিছু বাদ দেবে না।

একটু অসুবিধা দেখা গেল বন্যজন্তুর চামড়ার বেলায়। মাঠে জঙ্গলে শেয়াল কুকুর ম'রে পড়ে যদি, তার চামড়ার দাম লাগবে না ঠিকই। কিন্তু চামড়াটা খুলে আনতে হবে অগস্টকেই। কিন্তু ও-কাজটা তেমন রুচিকর নয় ওর পক্ষে। তাছাড়া ওতে সময়ও যাবে অনেক। অন্যদিকে কাজের ক্ষতি হয়ে যাবে ওর। তাই সে একদিন প্রস্তাব দিল এডভার্টকে—"তুমি এসো না কেন আমার সঙ্গে! আমার উপকার করাও হবে, আবার কিছু কিছু পকেটে আসবেও তোমার! আমি বিনা পয়সায় খাটাব না তোমাকে।"

আপত্তি কী এডভার্টের? সে ভেবে দেখল, এ-সময়টা পল্‌ডেন-বাসীদের পক্ষে রোজগারের সময় নয়। সবাই গায়ে ফুঁ দিয়ে আড্ডাবাজি ক'রে ক'রেই মাসের পরে মাস কাটিয়ে দিচ্ছে। গাঁটের কড়ি ভেঙ্গে ভেঙ্গে প্রথমে খাচ্ছে কিছুদিন ভরপেট, তারপর নেমে আসছে আধপেটা, সিকি-পেটা খাওয়ায়। অগস্টকে ধন্যবাদ দিতে হয়। গাঁয়ে এডভার্টের বয়সী ছেলে আরও তো ঢের ঢের রয়েছে, তাদের কাউকে না ডেকে এডভার্টকেই সে ডেকেছে সঙ্গে আসবার জন্য। অবশ্য অন্য কোন ছেলে ঠিক এডভার্টের মত এতখানি ডাগড়া বা চটপটে নয়। তা তাতে আর এমন কী? যে কাজ করবার জন্য লোক রাখতে হচ্ছে অগস্টকে, এমন কিছু শ্রমসাধ্য কাজ তা নয়। আর উঁচুদরের চালাক লোক ছাড়া সে কাজ যে করতে পারবে না কেউ, এমনও কিছু নয়।

রাজী হয়ে গেল এডভার্ট। কাজটা খুব নোংরা অবশ্য। তা, ঐ যে লফোটেন গিয়ে মাছ ধ'রে এলো চার মাস কাল, সে কাজই কি কম নোংরা? জল, কাদা, মাছের আঁইশ, পচা মাছের গন্ধ, নোংরা নয়?

কাজ শুরু হয়ে গেল। নগদ দামে চামড়া কিনে যাচ্ছে অগস্ট। এত এত খুচরো নোটও আছে ওর ব্যাগে! টক টক ক'রে টেনে বার করছে, আর ঝাড়ালো গোঁফের নীচে সোনার দাঁত বার ক'রে হেসে নিচ্ছে এক একবার। "আরও ঢের চামড়া দরকার খুড়ো! মস্ত খদ্দের আছে আমার। যত দিতে পারব, ততই নেবে। কোথায় যে পাব অত চামড়া?"

কিন্তু সে-ভাবনা আর ভাবতে হ'ল না অগস্টকে। একটা সুরাহা হয়ে গেল একান্তই দৈবাৎ। একটা পাগলা কুকুর এলো। কী জানি কোথা থেকে পল্‌ডেনে এসে পড়ল, কেউ বলতে পারে না। এলো আর রাস্তার যত কুকুরকে কামড়াতে লাগল। কাচ্চাবাচ্চা, গরুছাগল, সব-কিছুকেই ঘরে আটকে ফেলল গেরস্তরা, কিন্তু রাস্তার কুকুরদের কে সামলাবে? পাগলা কুকুরটা সগোত্রদের এলোপাথাড়ি কামড়াতে থাকল পথে বিপথে সর্বত্র।

পাগলাটাকে অবশ্য গ্রামবাসীরা পিটিয়ে মেরে ফেলল একসময়। তখন সমস্যা হ'ল গাঁয়ের কুকুরগুলোকে নিয়ে। অন্ততঃ শো-খানিক তো হবেই কুকুর পল্‌ডেনে! এদের মধ্যে কোন্‌টাকে যে কামড়েছে পাগলাটা, আর কোন্‌টাকেই বা কামড়ায় নি, কে তা বলতে পারে? গ্রামবাসীদের যদি নিরাপদ হতে হয়, ঝাড়েবংশে সব কুকুর খতম ক'রে দেওয়াই হ'ল তার উপায়। বড় বড় লাঠি হাতে নিয়ে জোয়ানেরা বেরিয়ে পড়ল দল বেঁধে। কুকুর দেখা-মাত্র দমাদ্দম পিটোতে লাগল তাদের। তিন দিনের মধ্যে শো-খানিক কুকুরকে সাবাড় ক'রে দিল তারা। তারপর একটা বিরাট গর্ত খুঁড়ল তাদের কবর দেওয়ার জন্য। টেনে টেনে নিয়ে এলো সব মরা কুকুরকে সেইখানে। ফেলতে যাবে গর্তে তাদের—

তখনই অগস্ট আর এডভার্ট এসে বলল—"কবর আমরাই দেব, তবে তার আগে চামড়াগুলো ছাড়িয়ে নেব ওদের।"

তাতে আর আপত্তি কী গ্রামবাসীদের? ধড়গুলো মাটির তলায় চাপা দেওয়া নিয়ে কথা তাদের।

সে এক বিতিকিচ্ছি ব্যাপার! অগস্টে আর এডভার্টে মিলে যা করতে থাকল দিনের পরে দিন। চামড়া ছাড়ানো, চামড়া ছাপাই করা, চামড়া শুকোনো—ইস্!

তারপর তাদের গুদামজাত করা। কোথায় করা যাবে গুদামজাত? অত জায়গা আছে কোথায়?

একসাথে রাখবার মত জায়গা কোথাও নেই। এ-বাড়ীর গোলাঘরে কিছু, ও-বাড়ীর গোয়ালঘরে টং বেঁধে তাতে কিছু, যেখানে পাঁচ ফুট জায়গা পাচ্ছে ওরা, সেইখানেই ওরা ঢুকিয়ে রেখে আসছে এক রাশি চামড়া।

কেন রাজী হচ্ছে গেরস্তরা?

ভাড়া! ভাড়া! একটা সেণ্ট যদি ভাড়া পাওয়া যায়, তাই মন্দ কী!

গরমের দিনে মেলা বসে স্টকমার্কনেস-এর সমুদ্রকূলে। চার দিনের মেলা, ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে পাঁচ ছয় দিনও হয়ে যায়। পেল্লায় মেলা। দূরও অনেকটা পল্ডেন থেকে। খোলা সমুদ্র বেয়ে যেতে হয় সেখানে। বেশ একটু বড় নৌকা দরকার, সে-সমুদ্র পাড়ি দিতে হলে।

এতদিনে অগস্ট প্রকাশ করেছে, তার চামড়ার গাদা তাকে পৌঁছে দিতে হবে ঐ স্টকমার্কনেস মেলাতেই। ট্রন্‌জেম একটা মস্ত বড় বাজার উত্তর নরওয়ের। সেখানকার প্রসিদ্ধ চামড়া-ব্যবসায়ী ক্লেম, হ্যানসেন কোম্পানীর নাম কে না শুনেছে? ভাল একজোড়া জুতো যে-কেউ কিনেছে কোনদিন, সেই দেখেছে, জুতোর তলায় চামড়ার উপরে সীলমোহর রয়েছে ক্লেম, হ্যানসেন-এর। তাদের সঙ্গে কী সূত্রে যোগাযোগ করেছিল অগস্ট, তা সে প্রাণান্তেও প্রকাশ করবে না। গভীর জলের মাছ ও।

মেলার দিন নিকটবর্তী। অগস্ট উঠে প'ড়ে লেগেছে নৌকো ভাড়া করার জন্য। বেশ একখানা বড় নৌকাই দরকার। পাহাড়-প্রমাণ চামড়া বোঝাই হবে যে-নৌকায়, তা ছোট হলে চলবে কেন? মাঝদরিয়ায় ডুবে যাবে না?

বড় নৌকা! পল্‌ডেনে বড় নৌকা একখানাই আছে। কেরোলাসের আট-দাঁড়ী বজরা। লফোটেন থেকে মাছ ধরে ফেরার পরে কূলেই বাঁধা রয়েছে এখনো। এইবার গোটা গ্রীষ্মকালের জন্য তাকে তুলে ফেলতে হবে অগভীর জলে, আচ্ছাদনের নীচে। তোড়জোড় চলছে তারই, এমন সময় অগস্ট গিয়ে বলল কেরোলাসকে —"বজরাখানা ভাড়া দাও আমায় দিন দশেকের জন্য। স্টকমার্কনেস যাব আর আসব।"

"না, ভাড়া দেব না"—সাফ জবাব কেরোলাসের।

"কেন? দেবে না কেন? পয়সা পাবে—"

"তা তো পাব! কিন্তু তুমি আর এডভার্ট, এই দু'টি ছোকরা ঐ প্রকাণ্ড নৌকা নিয়ে দরিয়ায় ভাসতে যাও যদি, নির্ঘাৎ ডুবে মরবে। মরবে তোমরাও। মরব আমিও। নৌকার দাম এখনো শোধ করতে পারি নি, এই সময় নৌকা ডোবে যদি, আমি পথে বসব।"

"তাহলে একদম বেচে দাও বাবা আমার কাছে। তারপরে নৌকা ডোবেও যদি, তোমার তো লোকসান হবে না কিছু!"

আরে, বলে কী! এই বিরাট বজরা কিনে নেবে অগস্ট? এত পয়সা ওর? একদম দমে গেল কেরোলাস। এত-বড় পয়সাওয়ালা একটা লোককে বিমুখ করা উচিত হবে না। যাক, নিয়ে যাক। ও তো জাহাজে কাজ করেছে। ওর দাঁত তো ভেঙেছিল, মাস্তুল থেকে প'ড়েই! নৌকো ও নিশ্চয় চালাতে পারবে।

অগস্টের দাঁত যে মাস্তুল থেকে পড়ে গিয়ে ভেঙেছিল, এমন কথা অগস্ট কিন্তু কোনদিন বলে নি। "একটা দুর্ঘটনা ঘটেছিল"— এইটুকুই সে প্রকাশ করেছে পল্‌ডেনে এসে। মাস্তুল থেকে পড়া, সেটা পল্‌ডেনবাসীদের নিজস্ব গবেষণাপ্রসূত তথ্য।

যা হোক, বজরাখানা ভাড়া পেয়ে গেল অগস্ট। রাশি রাশি চামড়া তাতে বোঝাই হ'ল দুই দিন ধরে। তারপর প্রয়োজন মত খাদ্যসামগ্রী সঙ্গে নিয়ে অগস্ট আর এডভার্ট শুভ যাত্রা করল স্টকমার্কনেস-এর অভিমুখে।

পল্‌ডেন জায়গাটা এক খাঁড়ির মধ্যে। খাঁড়ি যেখানে সমুদ্র থেকে ডাঙ্গায় ঢুকেছে, সেটা হ'ল বাহির পল্‌ডেন। সেখানে আসতেই সমুদ্রের হাওয়ায় পাল তুলে দিল অগস্ট। বেয়ে-যাওয়ার মধ্যে শক্ত কিছু নেই। দুইজন আছে তারা। একজনকে অবশ্য হাল ধ'রে বসেই থাকতে হবে। অন্যজন ততক্ষণ চামড়ার গাদায় ঠেসান দিয়ে ঝিমোক না। পালা ক'রে ক'রে হাল ধরছে দুইজন।

বাহির-পল্‌ডেনের ওধারে হ'ল ভেস্টফিয়র্ড। সেটা পেরুবার সময় তিলমাত্র কষ্ট পেলো না ওরা। মৃদু মৃদু হাওয়া লাগছে পালে। নরওয়ের আকাশে এ-সময়ে চব্বিশ ঘণ্টাই সূর্য জ্বলজ্বল করে। এই-টিকেই তো বলে নিশীথ সূর্যের দেশ। মনের আনন্দে অগস্ট কখনও ধরছে গান, কখনো একধার থেকে ইংরেজী জবানে কথা ক'য়ে যাচ্ছে আপন মনে। সুযোগ পেলে বরাবরই ইংরেজী বলে ও। আহ্লাদে ডগমগ ও। দুনিয়া যেন পায়ের তলায় তার। "চল্ না, এই নৌকো নিয়েই এগিয়ে যাই আটলান্টিক পর্যন্ত। আমি ঠিক পাড়ি দিতে পারি আটলান্টিক। এই নৌকো নিয়েই।"

জোলো জোলো দু'টো চোখ। সে-চোখের দিকে তাকালে কেউ ভাবতে পারবে না যে অগস্ট-ছেলেটার মধ্যে বুদ্ধিশুদ্ধি বিশেষ আছে। তবু, এক একখানা মতলব যা ও বার করে! এই দেখ না। পল্‌ডেন থেকে এত চামড়া যোগাড় হতে পারে, কে ভেবেছিল? যদি সত্যি সত্যিই এই চামড়ার বিনিময়ে ডলারের কাঁড়ি এসে ওঠে ওর পকেটে, তা হলে তো যাদুকর বলতে হবে ওকে!

আরে, ওদিকে ও-জায়গাটা কী দেখা যায়? যাঃ! বেশী উত্তরে সরে এসেছে ওরা! ও হ'ল হিন্দো পাহাড়। এখানটায় পাহাড়ে ঘা খেয়ে খেয়ে হাওয়াতে চিরদিনই জোর লাগে বেশী বেশী। তায় রাতও ঘনিয়ে আসছে। আকাশে সূর্য থাকলেও সমুদ্রে মানুষ থাকবে না। একা একা এই নৌকাখানাকেই যদি এই বিজন জলের রাজ্যে ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে লড়তে হয়, ভাল লাগবে না তা।

যা হোক, এখন পর্যন্ত ভাবনার কিছু নেই। অগস্টকে হালে

বসিয়ে দিয়ে এডভার্ট শুয়ে পড়ল, এক ঘুম ঘুমিয়ে নেওয়ার জন্য।

হাল ধ'রে ব'সে আছে অগস্ট। আগের মত আনন্দ আর টগবগ করছে না তার মনে। গা গুলিয়ে আসছে। সমুদ্র-পীড়ার মত অবস্থা! অবাক হবার কিছু নেই। পাকা নাবিক বটে অগস্ট। কিন্তু ও যা-কিছু চলাফেরা করেছে সমুদ্রে সমুদ্রে, বড় বড় জাহাজেই তা করেছে। উত্তর অঞ্চলের এই ক্ষুদে ক্ষুদে নৌকো ওর কাছে নতুন। নতুন, এই বিদ্‌ঘুটে স্বভাবের সমুদ্রও। দেখ না! হঠাৎ সূর্যটা নিবে গেল। একটা হাওয়া এসে চারিদিকে ফুটিয়ে তুলল সাদা একটা ধোঁয়াটে আবরণ। পিছনে তাকাতে গিয়েই অগস্ট দেখল, আকাশ কালো।

নামল বৃষ্টি। বৃষ্টি? যা-তা-বৃষ্টি নয়, শিলাবৃষ্টি। সঙ্গে ঝড়। মারাত্মক ঝড় না হলেও ঝড়ই বটে। এই বাহির সমুদ্রে একান্ত নিঃসঙ্গ নৌকাখানা ঝড়ের মুখে পড়ে গেল এক-নৌকা চামড়া বোঝাই নিয়ে?

অগস্ট ডেকে তুলল এডভার্টকে। সে তড়বড় করে উঠে বসল। "ওদিকে নৌকোর মুখ কেন?"—চেঁচিয়ে উঠল এডভার্ট।

"ফিরে যাব"—বলল অগস্ট। তার ভয় করছে বেজায়।

"ফি-রে?"—এডভার্ট চ্যাচাচ্ছে—"এই হাওয়ায় নৌকো ফেরানো যায়?"—সে লাফিয়ে উঠে পাল নামিয়ে ফেলল।

এইবার অগস্ট হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে যে লফোটেনের মেছো-নৌকোতে আর সমুদ্র পারাপারের জাহাজে তফাৎ ঢের। নৌকার উপরে উঠে দাঁড়ানো যায় না। যা-কিছু করবার ব'সে ব'সে কর। হাঁটু গেড়ে ব'সে। অসুবিধা যত বাড়ছে, ভয়ও ততই বাড়ছে। "হে ভগবান! উপায় কী এখন?" কাৎরাচ্ছে পাকা নাবিক অগস্ট।

নৌকায় জল উঠছে ঢেউয়ের। যা হোক, চলছে এখনো সোজা হয়েই। "রাফস্থণ্ডে পৌঁছোলে বাঁচি যে!"—বলছে এডভার্ট।

অগস্ট একেবারে বেসামাল—"এ আমারই পাপের ফল"—সে নিজের গালে চড় মারছে ঠাস-ঠাস করে।

এডভার্ট অবাক—"পাপটা কী?"

"সোনা দিয়ে দাঁত বাঁধিয়েছিলাম। সামান্য আগাম যা দিয়েছিলাম কারিগরকে, তার পরে আর কিছুই দিই নি। দাঁত নিয়েই সেখান থেকে চম্পট দিয়েছিলাম। সেই পাপেই আজ প্রাণটা গেল বোধ হয়।"

এডভার্ট রেগে উঠল—"তুমি পাপ ক'রে থাকতে পার, আমি তো করি নি! অন্ততঃ আমার মুখ চেয়েও নৌকাটা বাঁচিয়ে দিতে হবে ভগবানকে। তুমি স'রে এসো, হাল আমাকে দাও। চামড়াগুলো ভিজে গেল সব।"

"মরুক গে চামড়া। আমরা বাঁচলে যে বাঁচি!"

বড় পাল আগেই নামিয়ে ফেলেছে এডভার্ট, ছোট একটা খাটানো আছে এখনও। এবার সেটাও নামিয়ে দিতে বলছে ও। অগস্ট বিনা ওজরে মেনে চলছে তার কথা। মানবে না কেন? হুকুম তামিল করাই তো ওর কাজ ছিল চিরদিন। জাহাজে জাহাজে মাল্লাগিরিই করেছে সে, কাপ্তেনি তো আর করে নি! তাও মাল্লাগিরিতেও কি আর সে একনিষ্ঠ ছিল চিরদিন? এক কাজে বেশী দিন লেগে থাকা তার ধাতুতে পোষায় না। একটা ছেড়ে আর একটা, কত কীই যে সে করেছে এই কুড়ি বছরের জীবনে! জমিতে লাঙল পর্যন্ত ঠেলেছে। তারপর ধর এই চামড়া-ছাড়ানোর কাজ। বাদ দেয় নি কিছু। এই ভাবে অভিজ্ঞতা কিছু সঞ্চয় সে সত্যিই করেছে। গভীর না হোক, ব্যাপক অভিজ্ঞতা।

জলে ডোবার সময় মানুষ নাকি এক মিনিটের মধ্যে সারা জীবনের সমস্ত ঘটনা স্মৃতির পটে অঙ্কিত দেখতে পায়। অগস্ট ডোবে নি এখনো, হয়ত-বা ডুবতে হবে—এই আতঙ্কেই পূর্বজীবনের সব পাপের কথা তারস্বরে নিবেদন ক'রে দিচ্ছে ভগবানের উদ্দেশে। দাঁত-বাঁধিয়ে নিয়ে কারিগরের মজুরি ফাঁকি দেওয়া থেকে শুরু

করেছিল পাপের ফিরিস্তি, সে-ফিরিস্তি অচিরে শেষ হওয়ার কোন লক্ষণ দেখতে পাচ্ছে না এডভার্ট। সে রেগে উঠে জিজ্ঞাসা করল—"ওসব কে শুনতে চাইছে তোমার?"

"চাইছেন ভগবান। পাপের কথা ভগবানকে সরলভাবে বললে ক্ষমা পাওয়া যায়, তা জান না?"—জবাব দিল অগস্ট।

"পাপের কথা ভগবানকে বলার সময় পরেও পাবে। এখন যদি বাঁচতে চাও, নৌকো থেকে জল সেঁচে ফ্যালো।"

অগস্ট যত মুষড়ে পড়ছে, এডভার্ট ততই ফুলে উঠছে। এখন সে একটা পাকাপোক্ত কর্ণধারই যেন, পাইলট, ক্যাপ্টেন। আর অগস্ট তুচ্ছ মাল্লা।

অগস্ট কিন্তু জল সেঁচবার দিকে উৎসাহ দেখাচ্ছে না মোটে—"কী হবে ওসব করে? এ-বিপদে নিস্তার নেই আমাদের।"

"কী বোকার ডিম!"—ঝাঁঝিয়ে উঠল এডভার্ট—"আমি যে ডাঙ্গায় ভিড়বার চেষ্টা করছি, তাও দেখতে পাচ্ছ না?"

অগস্ট সেঁউতি নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল ঠিকই, কিন্তু মন তার অন্যদিকে। পরকালের কথা, নরকাগ্নির কথা, এসব সে শুনেছে তো। পাপীর পক্ষে নরকাগ্নি থেকে রেহাই যদি পেতে হয়, তাহলে তার একমাত্র উপায় হচ্ছে আদ্যোপান্ত সারাজীবনের ছোট-বড় সব পাপের কাহিনী অকপটে ভগবানকে খুলে বলা। কোন যাজকের মারফত জানাতে পারলেই হয় ভাল। যেখানে নেই যাজক, সেখানে মুখোমুখি কারবার করতে হবে ভগবানের সঙ্গেই। কল্পনা ক'রে নিতে হবে যে তিনি সমুখেই আছেন।

ঘণ্টা খানিক ধ'রে জল সে সেঁচে যাচ্ছে দুই হাতে, অথচ মুখ তার অনর্গল আউড়ে যাচ্ছে তার এতকালের সব গোপন কথা। অবশেষে এক সময়ে সে ব'লে উঠল—"আর তো ছাই মনে পড়ছে না কিছু। ঐ নিয়েই তুষ্ট হও ভগবান, জানটা বাঁচাও এযাত্রা।"

এতক্ষণ নৌকা এগিয়েই চলেছে। হিসাব-মত রাত দুপুর প্রায়। যদিও সূর্যকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না আকাশে। সমুদ্র উত্তাল।

শিলাবৃষ্টিটা বন্ধ হয়েছে, কিন্তু আকাশ এখনো কালো। তার মানে বৃষ্টি আরও হবে। এই আলো-আঁধারিতে নৌকা বাওয়া যে কতখানি বিপজ্জনক! সমুদ্রের কোথায় কোন্ স্রোত বইছে, কিছুই জানে না ওরা। অগস্ট তো এ-সমুদ্রে একেবারে নতুন। এডভার্টও লফোটেনের এদিকে একবারও আসে নি। ডাইনের দিকে ডাঙ্গা আছে, বিশ্বাস এডভার্টের, সেই দিকেই নৌকার মুখ সে রেখেছে বরাবর।

হিন্দোর পাহাড় একবারটি দেখা দিল কয়েক মিনিটের জন্য। কিন্তু ওদিকে নৌকা ভেড়াবার মত জায়গা পাওয়া যাবে কি? লফোটেন পাহাড়ে সে-রকম জায়গা অগুন্তি আছে। বাঁয়ে লফোটেন, কিন্তু অনেক, অনেক দূরে। আর হাওয়া বইছে উল্টো, সেদিকে এগুতে হলে বাকী পালখানাও নামিয়ে ফেলে দাঁড় ধরতে হয়। অসাধ্য ব্যাপার।

"ডাঙ্গা তো খুব বেশী দূর বলে মনে হচ্ছে না"—বলছে অগস্ট। সব পাপ সে স্বীকার ক'রে শেষ করেছে, মনে সাহস এসে গিয়েছে নতুন করে।

হঠাৎ "গুরু গুরু মেঘ গুমরি গুমরি গরজে গরজে গগনে।" বড় বড় শিলা পড়ছে ধপ ধপ ক'রে চামড়ার গাঁইটে। হাওয়া! দমকা হাওয়া ধেয়ে এলো ভিজে পাখায় ভর করে। লাগল পালে। নৌকোটা কাৎ হয়ে পড়ল খানিকটা। অগস্ট ককিয়ে উঠল—"পাপ তো স্বীকারই করলাম আমি। আবার কেন এসব?"

৩

অবশেষে মেলায় পৌঁছোলো ওরা।

কী ভিড়! আর কী গোলমাল! একটা ছোট-খাটো বন্দর এখানে। বড়-ছোট এত এত নৌকা এসে ঢুকেছে তাতে, তার জল চোখে পড়ছে না। আরও নৌকা আসছে, ক্রমাগতই আসছে। এদিকে কূলেও ভিড় এমন প্রচণ্ড যে বালি চোখে পড়ছে না সৈকতের। নামডাল থেকে এসেছে দু'টো ছোকরা। এসেই মদ গিলেছে আকণ্ঠ, এমন ঝগড়া করছে আর আস্তিন গুটোচ্ছে, যেন এক্ষুণি লেগে যাবে লড়াইয়ে। লাগে যদি লড়াই, কেউ ছাড়াতে যাবে না তাদের। নিজের কাজ বা নিজের ফুর্তি ফেলে রেখে পরের ঝামেলায় কে মাথা দেবে? এখানে পুলিশের বালাইও নেই। চাচা, আপনা বাঁচা।

অগস্ট চ'লে গেল, ক্লেম, হ্যানসেন কোম্পানী কোথায় আড়ত বসিয়েছে, খুঁজে বার করবার জন্য। এডভার্ট এদিক ওদিক ঘুরছে, সব-কিছুই নেড়ে চেড়ে দেখছে। ছোট ছোট দোকান, কোনটাতে দামী মাল, কোনটাতে সস্তা। লফোটেনে কখনও এত এত মাল গাদা-করা দেখতে পাওয়া যায় না দোকানে দোকানে।

শুধু কি কেনা-বেচাই নাকি? ফুর্তির বান ডেকেছে, তারই বা কত রকম উপকরণ। বেদে-বেদেনীরা আকাশে হাঁটছে, একগাছা সরু দড়ির উপর দিয়ে। বাজনাওয়ালারা বাজাচ্ছে হাত-অর্গান, ভালুক বা বাঁদর নাচাচ্ছে কেউ, ফেরিওয়ালা, নাগর-দোলা, গণৎকার দৈবজ্ঞ, কফি আর সোডাওয়াটার বিক্রিওয়ালা, পৃথিবীর সবচেয়ে মোটা মেয়েমানুষ, দুই-মাথাওয়ালা বাছুর—

বুড়ো পাপটও রয়েছে, ইহুদী ঘড়িওয়ালা, যার গায়ের কোটে একশো-একটা পকেট আছে। আলাপ করবার মত একটা মানুষ এই পাপট বুড়ো। এডভার্ট ওর আশেপাশে ঘুর ঘুর করল কিছুক্ষণ। ঘাড় কিনবার জন্য নিশ্চয়ই নয়। তার পয়সা কোথায় যে ঘড়ি

কিনবে সে ? ঘুরঘুর করল স্রেফ তাকিয়ে তাকিয়ে দেখবারই জন্য। গাদা গাদা ঘড়ি ঝকমক করছে রোদ্দুরে, একটা দেখবার জিনিস নয় ? এডভার্ট দেখে আর ভাবে, কী ধনী ঐ পাপট ! এত ঘড়ি ওর !

ইহুদী ! যাযাবর ! কিন্তু এই পাপট আর যাযাবর নয়। ও এই নরওয়েতেই স্থায়ী ভাবে রয়েছে অন্ততঃ পঞ্চাশ বছর। কেন রয়েছে, কে বলবে তা ? ঘড়ির ব্যবসা করতে হলে নরওয়ের বাজারই যে উৎকৃষ্ট, এমন কথা সে নিশ্চয়ই ভাবে নি। তবু এই দেশেই ও আছে। হেন শহর নেই, যেখানে ও যায় নি। হেন মেলা কোথাও বসে না. যেখানে ঘড়ি ও বেচে না। নরওয়ের ভাষা ও জানে, সব কথাই বোঝে, সব কথাই গুছিয়ে বলতে পারে, যদিও বলার বেলায় তাতে ভিন্‌দেশী টান থাকে একটু। ভিন্‌দেশী ! কিন্তু ঠিক কোন্ দেশী, তা পাপট বলতে পারবে না, যা হোক, লোকটাকে পছন্দ করে সবাই। ঐ বেঁটে মোটা মানুষটা, বুকে পেটে জামার এপাশ থেকে ওপাশ পর্যন্ত টানা গোছা গোছা ঘড়ির চেন, সবাইকেই ও ডাকছে ঘড়ি কেনার জন্য। ধনীকে এগিয়ে দিচ্ছে দামী সোনার ঘড়ি, গরিবকেও বুঝিয়ে বলছে—"এই যে রূপোর ঘড়িটা তোমায় দিচ্ছি বাবা, দামে এত সস্তা হলেও জিনিস খেলো নয়, ব্যবহার করলেই বুঝবে।" খদ্দের বুঝে কথা বলে ও। মাল গছাবার কৌশল সকল জায়গায় এক নয় পাপটের।

এক ছোকরা হয়ত বড় বড় চোখে তাকিয়ে আছে ওর ঘড়ির গাদার দিকে, পাপট এগিয়ে দিল একটা তার দিকে—"এটা হাতে ক'রে দেখই না একটু।" ছোকরা হাতে নিল, নেড়ে চেড়ে দেখল, দামও জিজ্ঞাসা করল, তারপর, দাম শোনার পরই পাপটের হাতে ফিরিয়ে দিতে গেল ঘড়ি। কেনার আশা সে আগেও করে নি, এখনও করছে না।

কিন্তু পাপট ঘড়ি ফিরিয়ে নেবে না। "আরে, তোমার কাছে আছে কত ?" ছোকরা হয়ত যে-পরিমাণ অর্থের কথা বলল, তা পাপটের দামের অর্ধেক। তাতেও কিন্তু দমবে না পাপট। "ঘড়িটা

তুমি নিয়েই যাও বাবা! কাজ দেবে। দাম? যেটা কম পড়ছে, সেটা ধার থাকুক। আসছে বছর আবার এই মেলাতেই শুধে দিও। তুমি ভাল বংশের ছেলে, বুড়ো পাপটের দু'টো পয়সা কি আর মেরে দেবে তুমি?"

ছেলেটা হয়ত এমন কিছু সাধুসন্ত ছেলে নয়। দরকার-মত ঢের সময়ে হয়ত ঢের লোককে অল্পবিস্তর ঠকিয়েছে এর আগে। কিন্তু বুড়ো ইহুদীর এই অযাচিত এবং দুঃসাহসিক সৌজন্যে সে মুগ্ধ না হয়ে পারল না। পরের বছর মেলায় ঠিক ঠিক পাওনা গণ্ডা মিটিয়ে দিল পাপটের। পাপট তো বলে যে জীবনে কেউ কোনদিন ঠকায় নি তাকে।

তা বলে সে নিজে কি ঠকায় না কাউকে? যীশু কহো! না-ঠকিয়ে ব্যবসা করা যায় না কি? সুযোগ মত অবশ্যই ঠকায় পাপট। ধরা যদি না-পড়ল, চুকেই গেল ব্যাপার। আর পড়লই যদি ধরা, হেসেই কুটিকুটি হল। "বড্ডো যাচ্ছেতাই ভুল করেছি তো!" এমন দাক্ষিণ্যের পরিচয় দেবে ভুল শোধরাতে গিয়ে যে খদ্দের আর কথাটি কইতে পারবে না।

অনেক সময় এমন এমন সব খদ্দের আসে, যারা সবজান্তা। হয়ত একটা দামী ঘড়িই দেখিয়েছে পাপট. নাকটা শিকেয় তুলে খদ্দের বলল—"এ আবার এমন কী জিনিস!" —দাম বলল ঠিক আদ্ধেক। পাপট ঘড়িটা ততক্ষণ পকেটে চালান করে দিয়েছে। এদিকে মুখ তার বন্ধ নেই। "কী? কী বললে বাবা? এত কম? আমার স্বভাব এইরকম, খদ্দের ফেরাতে হলে যেন পাঁজরার হাড় খুলে যায় একখানা। নিয়ে যাও। কিন্তু এটাও শুনে যাও যে ঐ দামে ঘড়ি-বেচা হ'ল আমার পক্ষে কবরের পথে এক পা এগিয়ে যাওয়া। দেউলে হয়ে যাব দু'দিনেই, খেতে পাব না। তা হোক, ঘড়ি যখন পছন্দ হয়েছে তোমার, নিয়ে যাও। ভাল হোক তোমার।"

পকেট থেকে ঘড়ি বার ক'রে খদ্দেরের হাতে দিল পাপট। ঘড়ি

সশব্দে টিকটিক ক'রে চলেছে। একবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল খদ্দের। হ্যাঁ, এই ঘড়িই তো পছন্দ করেছিল সে। ঠিক আছে।

নিজের দামেই ঘড়ি কিনেছে সে। আনন্দেই আত্মহারা। দামটা ফেলে দিয়ে নাগরদোলায় চড়তে গেল। হায়! সে কেমন ক'রে বুঝবে যে বুড়ো বজ্জাতটা বেদম ঠকিয়ে দিয়েছে তাকে! দেখতে হুবহু একরকম হলেও এ সে-ঘড়ি নয়, গোড়ায় যা দেখিয়েছিল পাপট। কোটের একই জায়গায় পাশাপাশি দু'টো পকেট। এক এক পকেটে এক এক দামের ঘড়ি। দেখতে একই রকম। কার সাধ্য ধরবে!

এই মেলাতেই এডভার্ট আবার দেখতে পেলো সেই এক-চোখ-কানা বাজনাওয়ালাকে, যে অর্গানের ভিতর থেকেই নেপোলিয়ঁ। দেখিয়েছিল পল্‌ডেনবাসীদের, বছর তিন-চার আগে। নিষ্ঠুর সাথীটা এখনো সঙ্গে আছে তার। বেজে চলেছে অর্গান, দৃশ্যের পরে দৃশ্য চমক দিয়ে যাচ্ছে খেলার থিয়েটারে, চারিধারে প্রচণ্ড ভিড়।

না, ভুল করে নি এডভার্ট। এরা সেই লোকই বটে। তবে বাজনাওয়ালার তখন ছিল একটা চোখ কানা, এখন কানা হয়েছে দু'টোই। একদম অন্ধ! যে দেখছে, সেই দয়ার্দ্র হয়ে উঠছে ওর উপরে। আ-হা! কত দূর-দেশের লোক! দু'খানা রুটির জন্য এই বিদেশে এসে পড়েছে অর্গান পিঠে করে, আ-হা! ঘন ঘন সেন্ট পড়ছে ওর সাথীর টুপিতে।

এডভার্ট তার পাশের লোকটিকে বলল—"আমি ওদের জানি। ও কানা নয়।"—এক নিশ্বাসেই সে বাজনাওয়ালার দিকে ঝুঁকে পড়ল —"সত্যি তুমি কানা?"

"হ্যাঁ, কানাই তো!"—বলল সে। কিন্তু ভয়ে ভয়ে চোখও ফেরালো এডভার্টের দিকে।

ওদিকে বাজনাওয়ালার সেই ষণ্ডা গুণ্ডা সাথীটা, ঠিক সেবারের মতই ধমক-চমক শুরু করেছে বাজনাওয়ালার উপরে। ধমকের সঙ্গে সঙ্গে কিল চড় ঘুষি। "এ কী? এ কী"—জনতা সমস্বরে চ্যাঁচাচ্ছে। বাচ্চা ছেলেরা দূরে সরে যাচ্ছে, বড়রা এগিয়ে আসছে।

সেই যে নামডালের ছোকরা দু'টো মদ খেয়ে ঝগড়া করেছিল নিজেদের মধ্যে, তারা এইবার এসে ষণ্ডাটাকে জাপটে ধরল। "ফেলে দাও সমুদ্দুরে! পাজীটাকে ফেলে দাও জলে!"—চীৎকার উঠছে চারিদিকে।

ষণ্ডাটা পালালো যা-হোক কোন রকমে। বাজনাওয়ালা এদিকে চোখের পাশ থেকে নীচুপানে হাত বুলোচ্ছে, যেন গালটা মুছতে ব্যস্ত। সে-গালে কী যেন তরল পদার্থ গড়িয়ে নামছে একটা। রক্তই বোধ হয়।

নামডালের ছোকরা একজন ওপাশ থেকে ব'লে উঠল—"এমন আশ্চর্য রক্ত তো আগে দেখি নি বাবা! এ যে আদ্ধেক নীল!"

"রক্তই নয়", বলল এডভার্ট—"নিজে নিজেই গালে কী একটা মাখিয়ে নেয় ও। এ-লোক দু'টোকে আমি আগেও দেখেছি কিনা!"

"রক্তই নয়?"

"মোটেই না। আর এই বাজনাওয়ালাটা অন্ধও নয়"—

আরও একজন লোক ভিড়ের ভিতর থেকে ব'লে উঠল—"না, অন্ধ ও নয়। আমিও আগে দেখেছি ওদের। উত্তর অঞ্চলে, ফিনমার্কে। ওটা ওদের পয়সা আদায়ের ফন্দী।"

নামডালারদের ভিতর একজন এগিয়ে গিয়ে খ্যাঁচ ক'রে কোমর থেকে ছুরি টেনে বার করল একখানা। এমন একটা ভাব করল যেন সেই ছুরি সে বাজনাওয়ালার চোখে বিঁধিয়ে দেবে। আর তাই দেখেই সভয়ে বাজনাওয়ালা দুই পা পিছিয়ে গেল এক লাফে। জনতার ভিতরে উঠল অট্টহাসি। অন্ধ যদি, তাহলে ও ছুরি দেখতে পেলো কেমন ক'রে?

অতি বদমাশ লোক এক জোড়া, সন্দেহ নেই। কিন্তু এত তুচ্ছ, এত ঘৃণ্য যে এদের গায়ে হাত তুলতেও গা ঘিনঘিন করে। "দূর হয়ে যা, দূর হয়ে যা"—সমস্বরে চীৎকার ক'রে উঠল জনতা।

বাজনাওয়ালা তবু অভিনয় করতে ছাড়ে না। হাৎড়ে হাৎড়ে হাঁটতে লাগল যেন সত্যিই অন্ধ। কিছুদূরে গিয়েই মিলিত হ'ল তার

সাথীর সঙ্গে। "আর এ-মেলায় কল্কে পাব না আমরা"—নীচু গলায় বলাবলি করল খানিক। তারপর চলে গেল মেলা থেকে। হ্যাডসেল দ্বীপ, মেলবো, জায়গায় জায়গায় খেলা দেখাতে দেখাতে। সেই পুরোনো অভিনয়। মারপিট. গালে রক্ত, সবই আগের মত। না করে কী করে? বাঁচতে তো হবে। এমন মগজ কী ওদের কারও নেই যে নতুন ফিকির কিছু বার করবে। চলো—চলো—গড়াতে গড়াতে এইভাবেই চলতে থাকো, যাবৎ মরণ এসে রেহাই না দেয়।

এদিকে এডভার্ট, সেই যে সকালে অগস্টের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়েছে তার, তারপরে আর দেখতে পায় নি তাকে। পেলোও না দেখতে সারাদিন। পরদিন সকালেও না। দেখা হ'ল অবশেষে দ্বিতীয় দিনের সেই সন্ধ্যার আগে। খুব গিলেছে মদ। দারুণ স্ফূর্তিতে আছে অগস্ট।

পাপটের ঘড়ি-বেচার কায়দাকানুন পর্যবেক্ষণ করছে এডভার্ট পাশে দাঁড়িয়ে। হেলে দুলে হেলে দুলে এলেন শ্রীল অগস্ট বাহাদুর। আনন্দে মশগুল একেবারে। মুখখানা টকটক করছে লাল। অনর্গল ইংরিজী বুকনি ঝাড়ছে মুখে। হাতে ঝলমল করছে সোনার আংটি একটা। গলায় রেশমী কাপড় জড়ানো একটুকরো, তাতে আবার ঝালর। যেমন থাকে মহিলাদের গলাবন্ধে।

এডভার্টকে দেখেই অগস্ট হাতছানি দিয়ে ডাকল তাকে। "খেয়েছিস কিছু? চল্, তোকে খাইয়ে আনি—"

একটা হোটেলে নিয়ে এডভার্টকে তুলল অগস্ট। হাঁক ছাড়ল —"মেটিয়া! মেটিয়া! আমার বন্ধুর জন্য রুটি, মাখন আর গরম গরম কাবাব! জলদি!"

দেখা গেল, হোটেলে রীতিমত খাতির আছে অগস্টের। তা না থাকলে অত তাড়াতাড়ি কোন খদ্দের খাবার পেতে পারে না কোন হোটেলে। বিশেষ ক'রে সেই সব হোটেলে, যেখানে পরিবেশিকারা তরুণী। তারা গল্পগুজব ক'রেই সময় পায় না তো খদ্দেরের দিকে নজর দেবে কখন?

যা হোক এডভার্ট পেয়ে গেল খাবার। খেতে খেতে সে শুনছে অগস্টের কাজ-কারবারের কথা—

"দিয়েছি গছিয়ে চামড়াগুলো। ক্লেম, হ্যানসেনকে। নগদ পয়সা বাপ! ভাবলাম—দুই দিন একটু আনন্দ করি। তাই আর কি—"

এডভার্ট জিজ্ঞাসা করল—"কত? কত পেলে চামড়ার দরুন?"

"অনেক! অনেক! এত যে পাব, তা নিজেই ভাবতে পারিনি" —বলল অগস্ট। বলল বটে, কিন্তু প্রকাশ করল না যে ঠিক কত সে পেয়েছে—চট ক'রে অন্য কথায় চ'লে গেল—"কাজের কথা শোন্ ভাই! আমি তো এখন পলৃডেনে ফিরতে পারছি নে। বিয়ে ঠিক ক'রে ফেলেছি। এই যে মেটিয়া, একেই করব বিয়ে। কাজেই নৌকো নিয়ে পলৃডেন যাওয়া, এটা ভাই তোমাকে একাই করতে হবে। কেরোলাসের ভাড়া যা দিতে হবে, তা তোমার হাত দিয়েই পাঠিয়ে দিচ্ছি।"

এডভার্ট চমকে উঠল—"একা নৌকো নিয়ে যাওয়া? তাও কি সম্ভব্ না কি? সমুদ্দুর ব'লে কথা! দেখলেই তো আসার সময়! ডুবতে ডুবতে বেঁচে গেলাম কতবার!"

"তাহলে এক কাজ করা যাক। নৌকোটা কিনেই ফেলি। কত দাম নেবে, নিক। পাঠিয়ে দেব লফোটেনে।"

"বেচবে কেন?"

"দেখে নেব—বেচে কি না"—

এ-কথার কোন মীমাংসা তখন-তখনই হ'ল না। হওয়া সম্ভবই ছিল না। অগত্যা খাওয়াতেই মন দিল এডভার্ট। এমন ষোড়শ উপচারে পানভোজন এর আগে আর কোনদিন সে করে নি।

খেয়ে দেয়ে তৃপ্ত যখন হ'ল সে, আর একবার তুলল নৌকোর কথা—"কিনতে চাইছ অত-বড় নৌকো। ও দিয়ে করবে কী?"

কী করবে? তাই তো! অগস্ট সেকথা তত ভেবে দেখে নি। পলৃডেন সে যেতে পারছে না যখন, এডভার্টও একা যেতে রাজী নয় যখন নৌকো নিয়ে, তখন কিনে ফেলা ছাড়া অন্য উপায় আর

কী থাকতে পারে? থাকতে পারে না ব'লেই কিনতে চেয়েছে সে। কেনার পরে নৌকোটা কোন্ কাজে লাগানো যেতে পারে, তা ভেবে দেখার সময় সে এরই মধ্যে পেলো কই?

অগস্টকে এতদিন দেখা গিয়েছে মিতভাষী। আজ সে ক্রমাগত বকেই যাচ্ছে—"তুমি ভাই নৌকোতেই গিয়ে থাকো। নৌকোতে একজন পাহারা থাকা ভাল। আমার জন্য ভেবো না। এই হোটেলে একটা ঘর ভাড়া নিয়েছি আমি। মানে. একটাই ঘর আছে পিছন দিকে, সেইটাই নিয়েছি। মেলা আর দুই দিন আছে এখানে। এ-দুই দিন মেটিয়া তো কাজ ছেড়ে যেতে পারবে না। পাঁচ দিনের চুক্তি ওর হোটেলওয়ালীর সাথে। আর দুই দিন ও আছে এখানে। আমিও আছি। তার পরে ওর সাথে চলে যাব ওর গ্রামে। সেখানে বাড়ী নেব একটা। বিয়ে সেই বাড়ীতেই হবে। তোমার কিন্তু আসা চাই বিয়েতে। নিশ্চয়ই আসা চাই।"

অগস্ট তখন দস্তুরমত মাতাল। যা-তা বকছে নেশার বশে, এ-সময়ে তাকে বোঝানোর চেষ্টা বৃথা হবে, তা এডভার্ট বিলক্ষণ বুঝতে পারছে। "আচ্ছা, কাল দেখা হবে"—ব'লে সে তখনকার মত বিদায় নিল।

"তোমার মজুরিটা আমি হিসেব ক'রে রেখেছি। আলাদা ক'রেই রেখেছি একটা আলাদা পকেটে। নিয়ে যাও—"

এক তাড়া নোট এডভার্টের হাতে দিল অগস্ট। "এ-ত? এ যে অনেক মনে হচ্ছে!"—বলল এডভার্ট।

"অনেকই তো হবে। তুমি না থাকলে তো আমি চামড়ার চালান-সুদ্ধ সমুদ্রে ডুবে যেতাম। দৈনিক মজুরির উপরেও লাভের একটা বখরা দিয়েছি তোমায়। সেটা অল্পই অবশ্য। আমার এখন দেদার খরচের সময়, বুঝতেই তো পারছ। বিয়ে করতে যাচ্ছি—"

পরদিন সকালেই কিন্তু এডভার্টকে ঘুম থেকে টেনে তুলল অগস্ট, নৌকায় এসে। হাউমাউ ক'রে কী যে সে বলছে, হঠাৎ বোধগম্যই হ'ল না এডভার্টের। প্রায় কাঁদো-কাঁদো অবস্থা অগস্টের।

অবশেষে ব্যাপারটা বুঝল যখন, তখন এডভার্টও মাথায় হাত দিয়ে ব'সে পড়ল। মেটিয়া পালিয়েছে। অগস্টের ব্যাগটা তো নিয়ে গিয়েছেই, তার হাত থেকে আংটি, পকেট থেকে সোনার ঘড়ি সব চুরি ক'রে চম্পট দিয়েছে। বাড়ী? একটা ঠিকানা মেটিয়া দিয়েছিল বটে, কিন্তু সে-ঠিকানা নিশ্চয়ই মিথ্যে ঠিকানা। যার পেটে পেটে অত শয়তানি, সে কি আর সত্যি ঠিকানা দেবে?

এডভার্ট সান্ত্বনা দিল—"যা হোক, পয়সাকড়ির উপর দিয়েই তোমার ফাঁড়া কেটে গেল, এইটেই এখন লাভ, মনে করতে হবে। ও-মেয়ের সঙ্গে তোমার বিয়ে যদি হয়েই যেত, সারাজীবন কষ্ট পেতে হ'ত তোমাকে। তুমি এখন বাড়ী চল। ঢের পয়সা রোজগার করতে পারবে আবার—"

"কিন্তু বাড়ী গিয়ে নৌকোভাড়া দেব কোথা থেকে?"—প্রায় কেঁদে উঠল অগস্ট।

"আমি দেব"—বলল এডভার্ট। "তুমি কাল মাইনে দিয়েছ না? তাই থেকেই দেব।"

৪

এডভার্টের চোখে অগস্ট একটা চিরন্তন বিস্ময়।

মেলা থেকে ও এ্যাকর্ডিয়ন* কিনে এনেছে একটা। এডভার্ট তো হেসেই কুটি-কুটি! "ওটা এনেছ কিসের জন্য শুনি? ইচ্ছে করলেই তো বাজানো যায় না ও-যন্তর! অনেকদিন চেষ্টা করলে তবে নাকি শেখা যায়। এখানে কে শেখাবে তোমায়?"

"আমায় শিখতে হবে না। আমিই শেখাতে পারি দুনিয়ার লোককে—" সদম্ভে শুনিয়ে দিল অগস্ট। এডভার্ট তা বিশ্বাস করবে কেন? 'স্রেফ ধাপ্পা', এই ব'লে সে উড়িয়ে দিল ওর কথা। কিন্তু তার পরদিনই সন্ধ্যার পরে মাঠে ব'সে অগস্ট সুর দিল এ্যাকর্ডিয়নে। গ্রামের লোক দৌড়ে এলো। এ-গ্রামে এমন বাজনা কেউ কখনো শোনে নি! মধুর! মধুর! মন-প্রাণ-কেড়ে-নেওয়া বাজনা! সেই জোচ্চোর অর্গানওয়ালার বাজনাও এর কাছে কিছু না! কোথায় শিখল অগস্ট? শিখেছিল তো এতদিন প্রকাশ করে নি কেন?

সেদিন রাতদুপুর পর্যন্ত ব'সে অগস্ট গ্রামবাসীদের বাজনা শোনালো। কিন্তু তারপর আর কোনদিন না। "আজ একটু বাজাও না!"—বললেই অগস্ট বলে—"বাজাতে পারি, যদি আমার কথা তোমরা রাখ।"

"কী কথা? কী কথা?"

"দশজনের ভাল হবে সেকথা রাখলে। একটা রোজগারের পথ খুলে যাবে গরিব গাঁয়ে।"

"আরে কী কথা?"

তখন অগস্ট খুলে বলল তার মনের কথা। অনেকদিন থেকেই সে ভাবছে এটা। এ-গাঁয়ে সমুদ্রকূলটাকে কড-মাছ শুকোনোর উপযোগী ক'রে তুলতে হবে।

---

* এক রকম বাদ্যযন্ত্র। হারমোনিয়ামের মত 'বেলোজ' আর দুই লাইন 'কী' থাকে এ.ত।

লোফোটেনে মাছ ধরে জেলেরা। দেশ-বিদেশের মেছো-জাহাজ সেখানে জমায়েত থাকে। জাল থেকেই মাছ কিনে নেয় তারা, গাদা করে যার যার জাহাজে খোলের ভিতর। চারমাস কাল কেনারই পালা। মেরুমণ্ডলের শীত, কাজেই চার মাস কেন, চার যুগ খোলের ভিতর পড়ে থাকলেও সে-মাছ পচে উঠবার কোন ভয় নেই।

হলো গাদা খোলের ভিতর রাশি রাশি কড মাছ। এদিকে মাছ-ধরার সময়ও শেষ হয়ে এলো। তখন জাহাজের কাপ্তেন ভাবতে বসল, এ-মাছ পরিষ্কার করে শুকিয়ে তোলা যাবে কোথায়। খাঁড়ির অন্ত নেই চারিদিকে। প্রত্যেক খাঁড়ির ধারে ধারে অনুচ্চ পাহাড়। সেই সব পাহাড়ের মাথায় মাথায় মাছ শুকোনোর জায়গা তৈরী ক'রে রাখে গ্রামবাসীরা। এক এক গ্রামে এক একটা করে মেছো-জাহাজ ভেড়ে গিয়ে। গ্রামবাসীদের ডাকে সাহায্যের জন্য। তারা আসে, জাহাজের খোল থেকে মাছ নামিয়ে নেয়, সমুদ্রের ধারে বসেই পেট চিরে নাড়িভুঁড়ি বার করে ফেলে মাছের। তার পরে ভাল ক'রে ধুয়ে ঝুড়ি-ভর্তি করে, পাহাড়ের মাথায় নিয়ে যাওয়ার জন্য, সেখানে জায়গা তৈরী আছে, একটা একটা করে মাছ শুইয়ে দেয় পাথরের উপরে, পরদিন উল্‌টে দেয়, নীচের দিকটা উপরে তুলে। এইভাবে দুই মাস ধরে মাছ শুকোনো হচ্ছে। ওদিকে মাছ সব নেমে যাওয়ার পরে জাহাজখানাকে ধুয়ে মুছে সাফ করে দিয়েছে গ্রামবাসীরাই, প্রয়োজনে নতুন রংও লাগিয়ে দিয়েছে। এদিকে মাছ যখন শুকোলো, ওদিকে জাহাজও তখন শুকিয়েছে। তখন গ্রামবাসীরাই আবার ঝুড়ি ভরে ভরে শুকনো মাছ জাহাজে নিয়ে আসবে। খোলে নামিয়ে সুশৃংখল ভাবে সাজিয়ে রাখবে গাদা করে। যাবে তো অনেক দূর! ট্রন্‌জেম, বার্জেন—মাছের সব বড় বড় আড়তই সুদূর দক্ষিণে।

মাছ যখন বোঝাই শেষ হলো, কাপ্তেন তখন গ্রামবাসীদের পাওনা মেটাবে। মেহনতের দুই তিন মাস একটা হপ্তাওয়ারি মজুরি দিয়ে এসেছে নির্দিষ্ট হারে। সে-সব হিসেব থেকে বাদ দিলেও প্রত্যেক গ্রামবাসী মবলগ অর্থ পেয়ে যাবে কাপ্তেনের কাছে। আগামী সালে

মাছ-ধরার ঋতু না-আসা পর্যন্ত হাত-খরচা চলতে থাকবে তার।

হ্যাঁ, এই যে নরওয়ে দেশটা, এর প্রতি খাঁড়ির কূলে কূলে এমনি সব জায়গা তৈরী হয়ে আছে আবহমানকাল। নিজের গরজে গ্রামবাসীরাই করে রেখেছে জায়গা। পাহাড়ের মাথায় মাথায়। রোদ্দুর যেখানে অঢেল, হাওয়া যেখানে অবাধ। সৈকতে বসে মাছ ধোয়ার জায়গা যেখানে প্রশস্ত, সৈকত থেকে পাহাড়ে ওঠার রাস্তা যেখানে সুগম—জায়গা কোনটা সরেস, কোনটা তত সরেস নয়। সরেস জায়গার জন্য কাড়াকাড়ি পড়ে যায় কাপ্তেনদের মধ্যে। একটা সরেস জায়গা যদি একবার হাতে পেলো কোন কাপ্তেন, সে আর সেটা হাতছাড়া করবে না প্রাণান্তেও। এবার যখন শুকনো মাছ বোঝাই নিয়ে ছেড়ে যাচ্ছে জাহাজ, আরবারের জন্য কথা তখনই ঠিক করে যাবে সে—"দেখো ভাই মোড়ল, আমার জায়গা যেন অন্য কাপ্তেনকে দিও না। তোমাদের সঙ্গে একটা দোস্তি হয়ে গেল যখন, এটা বজায় রাখতে চাই বরাবর।"

এই তো অবস্থা। খাঁড়ির ধারে ধারে যত গ্রাম আছে, কড মাছ শুকোবার পাহাড় আছে তার প্রত্যেকটাতেই। সে-পাহাড়টা পরিচ্ছন্ন ক'রে রাখে গ্রামবাসীরাই, তাদের একটা নিয়মিত রোজগার যে ওখান থেকেই আসবে।

সর্বত্রই আছে এরকম জায়গা, একমাত্র এই অভাগা পল্‌ডেনে ছাড়া। গাঁয়ের লোকগুলো চিরকেলে কুড়ে। এখানকার খাঁড়ির ধারে ঐ যে পাহাড়টা, ওর উপরটা তেমন সমতল নয়। পাথর কেটে-কুটে সমতল করে নিতে হবে ওটাকে। এখন সেইটুকু মেহনত কে করে বাবা?

যত গ্রাম খাঁড়ির ধারে ধারে, মাছ-শুকোবার জায়গা প্রতি গ্রামেই আছে। নেই কেবল পল্‌ডেনে। তার জন্য পল্‌ডেনবাসীদের আফশোষও নেই কিছু। জন্মান্ধ লোকের যেমন আফশোষ থাকে না দৃষ্টিহীনতার দরুন। এটাই যেন ভাগ্যলিপি ওদের, এই নিয়েই তুষ্ট আছে ওরা।

সেই তুষ্টিটাতে একটা ঢিল এসে পড়ল অগস্টের প্রস্তাবে। তার প্রস্তাব, সব গ্রামবাসী দল বেঁধে পাহাড়ের মাথায় গিয়ে উঠুক। গাছ-গাছড়া কেটে, ঘাস চেঁচে ফেলে, পাথর কেটে, গর্ত বুজিয়ে পরিষ্কার সমতল করে ফেলুক একেবারে। সৈকত চওড়াই আছে পাহাড়ের নীচে, সৈকতের নীচে জলও গভীর। জাহাজ ভেড়ানোর, মাছ সাফাই করার কোন অসুবিধে এমনিতেই নেই। চাই কেবল, সৈকত থেকে পাহাড়ে ওঠার সুঁড়ি-পাকদণ্ডিটাকে সুগম ক'রে নেওয়া।

এমন কিছু কঠিন কাজ নয়। গ্রামে যত সমর্থ লোক আছে, সবাই এককাট্টা হয়ে নেমে পড়লে সাত দিনেই কাজটা সমাধা হতে পারে। তারপর আর ওর পিছনে মেহনত নেই। কেবল বৎসরান্তে একবার করে ঘাসটাসগুলো চেঁচে নেওয়া। অথচ এইটুকুর বিনিময়ে —যতকাল ঐ পাহাড় আর ঐ খাঁড়ি থাকবে পল্‌ভেনে, ততদিন এ-গাঁয়ের লোক ফী-বছর দুটো নগদ পয়সার মুখ দেখতে পাবে ঘরে বসে। কম কথা?

"মেহনত না-হয় করব আমরা, কিন্তু কাপ্তেনরা নতুন জায়গায় আসবে কেন?"—একটা কিছু বলতে হয়, তাই বলল কেরোলাস। সে যখন গাঁয়ের মোড়ল।

"কেন আসবে না? যাতে আসে, তা আমি করব।"—বলল অগস্ট।

শেষ পর্যন্ত গ্রামবাসীরা রাজী হয়ে গেল। ফী বছর একটা বাড়তি রোজগারের লোভে তত নয়, যত ঐ এ্যাকর্ডিয়ন শুনতে পাওয়ার লোভে। অগস্টের কথামত চললে সে মাঝে-মাঝে এ্যাকর্ডিয়ন বাজাবে, কথা দিয়েছে। কম কথা নয়। বাজনার ব্যবস্থা যদি হয়, তাহলে মাঝে মাঝে ঐ পাহাড়ের মাথাতেই হোক, আর গির্জার সমুখের মাঠেই হোক, নাচের আসরও তো বসানো যেতে পারে!

তারপর পনেরো দিনের মধ্যেই পল্‌ভেনে মাছ-শুকোবার অতি-সুন্দর একটি জায়গা তৈরী হয়ে গেল। আর মাছ-শুকোবার দিন ঘুরে

আসবার অনেক আগেই গাঁয়ের ছেলেমেয়েরা সেখানে নাচের আসর বসাতে লাগল অগস্টের এ্যাকর্ডিয়নকে সমুখে রেখে।

দেখতে দেখতে এসে পড়ল হেমন্ত ঋতু, সাজ-সাজ রব জেলে-মহলে। কেরোলাসের আট-দাঁড়ী মেছো-বজরা ধুয়ে মুছে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখা হয়েছে, পাদরি সাহেবের বাছাই-করা শুভদিনে, তাঁর আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে জেলেরা বেরিয়ে পড়ল সাম্বৎসরিক মৎস্য শিকারের অভিযানে। এখন থেকে এই চার মাসেই যা-কিছু রুজি-রোজগার। বাকী আটমাস তো গাঁয়ের মাঠে হাওয়া খেয়ে বেড়ানো শুধু। তবে এবার ঐ পাহাড়টা সাফ করা গিয়েছে, ও-থেকে যদি কিছু বাড়তি পয়সার হয় আমদানি, সে তো ভাল কথাই।

তবে কথা এই, ওর উপরে ভরসা কিছু নেই জেলেদের।

কেরোলাসের বজরা বোঝাই। আটজন তো এই নৌকাতেই কাজ করবে। যারা এতে ঠাঁই পাচ্ছে না, তারাও চড়ে বসেছে নৌকায়। লোফোটেন পর্যন্ত তো যাবেই তাঁরা, সেখানে গিয়ে অন্য আস্তানা খুঁজে নেবে। জাল কাঁধে ফেলে সবাই ঘর থেকে বেরিয়েছে। যেতে হবেই লোফোটেন। ছোট ছোট ডিঙ্গি অনেকের আছে। তাতেও যাওয়া চলে লোফোটেন পর্যন্ত। কিন্তু সেখানে গিয়ে বড় বজরায় ঠাঁই যোগাড় করে নিতে হবেই। ছোট ডিঙ্গি থেকে কড মাছের জাল ফেলা যায় না।

এডভার্ট এবার কেরোলাসের দলে ঠাঁই পেয়েছে। স্টকমার্কনেস মেলায় যাওয়া-আসার বেলায় এতবড় বজরাখানা যেভাবে একা-হাতে চালিয়েছিল এডভার্ট, অগস্ট ফিরে এসে শতমুখে তার ব্যাখ্যানা করেছে গ্রামের লোকের কাছে। "পাকা মাঝি ও! পাকা মাঝি! ওকে আটলান্টিকে নিয়ে ছেড়ে দিলেও ও ডিঙ্গি বেয়ে ঠিক পেরিয়ে আসবে সেটা",—অগস্টের উচ্ছ্বাস আর থামে না। তাই শুনেই কেরোলাস নিজের দলে টেনে নিয়েছে ওকে।

এডভার্টকে নিয়েছে, কিন্তু তা বলে অগস্টকে নেবে না। অগস্ট গিয়ে করবে কী? ও জাল বাইতেও জানে না, দাঁড় বাইতেও জানে

না। নৌকায় জেলেদেরই জায়গা হয় না, বাজে লোককে উঠিয়ে কোন্ ফায়দা? না, অগস্টকে নেবে না কেরোলাস।

অগস্ট ক্ষেপে উঠল শেষ পর্যন্ত—"আমায় না নিয়ে যাও যদি, নিজেদের পায়ে কুড়োল মারবে তোমরা। অত মেহনৎ করে যে মাছ শুকোবার জায়গা করলে পল্‌ডেনে, দুনিয়ার লোক তা জানে? জায়গা যে আছে, তা জানতে দিতে হবে কাপ্তেনদের। সে কাজ তোমরা পারবে? ভদ্দরলোকের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে জানো?"

তখন কেরোলাস ধীরে ধীরে মাথা নাড়ে। তাইত! ও কথাটা খেয়াল হয়নি কারও। "তুমি পারবে সে কাজ?"—অগস্টকে জিজ্ঞাসা করল সন্দিগ্ধভাবে।

উত্তর দিল এডভার্ট, বন্ধুর হয়ে। "অগস্ট না পারে, এমন কাজও আছে না কি? যে এ্যাকডিয়ন বাজাতে পারে, সে কাপ্তেনগুলোর গলায় দড়ি বেঁধে হিড়হিড় করে টেনে আনতেও পারবে পল্‌ডেনে।"

অতএব চলল অগস্টও।

লোফোটেন পৌঁছেই সে কিন্তু অদৃশ্য হয়ে গেল। কোটের বুকে সোনার চেন ঝুলিয়ে আর হাতের আঙুলে সোনার আংটি পরে সেই যে সে নৌকা থেকে নেমে গেল, আর তার দেখা পেলো না জেলেরা অনেকদিন।

মাছ ধরার ফাঁকে ফাঁকে জেলেরা বলাবলি করে—অগস্ট ঘোরাফেরা করছে জাহাজে জাহাজে। খবর পায় তারা। অগস্ট যায়, কাপ্তেনের সঙ্গে কথাবার্তা বলে। কূলে দাঁড়িয়েই জেলেরা অনেক সময় দেখেছে তাকে। হাত নেড়ে নেড়ে কাপ্তেনদের সামনে লম্বা বক্তৃতা দিতে। না, ওভাবে বক্তৃতা দিতে কোন জেলে পারত না, তা ঠিক। অগস্ট কী করে পারছে যে, তা বোঝা যায় না। অগস্টও তো জেলেরই ছেলে!

যা হোক, এদিকে কাজ গুছিয়ে এনেছে অগস্ট। একদিন কেরোলাসের নৌকায় এনে হাজির করে দিল একটা জলজ্যান্ত কাপ্তেনকে। কাপ্তেন স্ক্যারো। "সী-গাল" জাহাজের কাপ্তেন।

পলডেনের পাহাড়ে মাছ শুকোবার যে নতুন জায়গা তৈরী হয়েছে, স্ক্যারো সেইখানেই মাছ শুকোতে রাজী আছেন। তাঁর পুরোনো জায়গাটা তিনি ছেড়ে দিতে চান। সে-গাঁয়ের লোকেরা গত বছর খুব বেগ দিয়েছে স্ক্যারোকে।

কেরোলাসের নিজের মুখে কথা যোগায় না। তাকে সমুখে খাড়া করে রেখে অগস্টই কথা কয়ে যাচ্ছে—"আপনার মত কাপ্তেনদের কাজে লাগতে পারব, এই আশাতেই আমরা পাহাড় কেটে মাঠ করেছি। আপনাদের বেগ দেব, আমরা কি নিজের ভালো বুঝি নে? প্রাণ দিয়ে খাটব আমরা, আপনার তরফ থেকেও কোন অবিচার হবে না আশা করি।"

"সে কী? সে কী? অন্য জায়গায় অন্য কাপ্তেনরা যে-হারে মজুরি দেন, তার চেয়ে কিছু বেশী হবে তো কম হবে না আমার এখানে।"

কথাবার্তা ঠিক হয়ে গেল। মাছ-ধরার মরশুম শেষ হলেই মাছ-বোঝাই জাহাজ নিয়ে স্ক্যারো পলডেনে আসছেন। একটা প্রশ্ন তুললেন তিনি—"আমায় পথ বাৎলাবে কে? ওদিকে তো যাইনি কখনো! চোরা-পাহাড়ে গুঁতো-টুঁতো খাব না তো?"

অগস্ট বলল—"আমিই নিয়ে যাব আপনাকে। আপনার জাহাজেই আজ থেকে আমি ডেরা ফেলছি। আমি যেকাজে এসেছিলাম লোকোটেনে, তা তো হাঁসিল হলো; বলেন যদি, আপনার পিছনেই ঘুরব এখন থেকে। জাহাজের কাজকর্ম আমি জানি। সাত সমুদ্দুরে ঘুরেছি, একথা বড়াই না করেই বলতে পারি।"

"হিসেব-টিসেব আসে? রোজ দেদার মাছ কিনছি, কাকে কত দিচ্ছি, টুকরো টুকরো কাগজে লিখে রাখছি শুধু। ঐগুলো একটা খাতায়, মানে হিসেবনবিশরা যেভাবে লেখে আর কি, তুমি যদি পার লিখতে—মানে, পরে আমাকে ওজন্য লোক খুঁজতেই হবে। এখনই যদি পেয়ে যাই—আজ থেকেই রাখতে পারি—"

অগস্ট পারবে হিসেব রাখতে। আজ থেকেই "সী-গাল" জাহাজের হিসেবনবিশ বনে গেল সে।

কেয়োলাসের বজরা আর স্ক্যারোর জাহাজ প্রায় এক সময়েই লোফোটেন থেকে এলো পল্‌ডেনে। খাঁড়ির কূল ঘেঁষেই গভীর জলে জাহাজ ভিড়িয়েছে অগস্ট। ঠিক সমুখেই পাহাড়ে উঠবার পথ। "এমন সুবন্দোবস্ত আমি অন্য কোথাও দেখিনি"—মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করলেন কাপ্তেন স্ক্যারো।

"নিজে দাঁড়িয়ে এসব করিয়ে নিয়েছি কাপ্তেন"—সগর্বে জবাব দিল অগস্ট। স্ক্যারোর বেশ সুনজরে পড়ে গিয়েছে সে। স্ক্যারো এখানকার সব কাজের ভার অগস্টের হাতেই ছেড়ে দিয়েছেন বলতে গেলে। সৈকতে বসে মাছ সাফাই করবে কোন্ কোন্ মেয়েরা, সৈকত থেকে ঝোড়া ভ'রে ভ'রে পাহাড়ের মাথায় তুলবে কোন্ কোন্ জোয়ানেরা; তারপর মাছ শুকোতে দেওয়ার জন্য যে কয়েকটা দল গড়া হবে, তাদের নেতৃত্ব করবে কারা, এসব বিষয় অগস্টের উপরেই ছেড়ে দিয়েছেন কাপ্তেন। অগস্ট এখন পল্‌ডেনের মধ্যে মোড়ল কেয়োলাসের চাইতেও বেশী খাতির পাচ্ছে ছেলে বুড়ো মেয়ে-মরদের কাছে।

ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে কাজ করছে মজুরেরা। অগস্ট একটা দলের নেতৃত্বে বসিয়ে দিল এডভার্টকে। এই নেতারা মজুরি কিছু বেশী পায় সাধারণ মজুরদের চেয়ে।

গ্রামে আর বেকার কেউ নেই। সবাই মাছ শুকোনোর কাজে ব্যস্ত। প্রতি শনিবার কিছু-না-কিছু অর্থ প্রত্যেকটা লোকের পকেটেই আসছে। গ্রাম জুড়ে একটা পরব চলছে যেন। লোকে দু'হাত তুলে আশীর্বাদ করে অগস্টকে। আর দু'হাত তুলে সেলাম বাজায় কাপ্তেন স্কারোকে।

স্ক্যারো লোকটি ভাল। কাপ্তেন বলে দেমাক নেই কিছু। কাজে ফাঁকি ধরবার জন্য ছোঁক ছোঁক করে ঘুরে বেড়াবার অভ্যাস নেই। কখনো একবার সৈকতে দাঁড়ান, মাছ-ধোয়ার ব্যাপারটা দেখবার জন্য, কখনও হয়ত একবার পাহাড়ের মাথায় ওঠেন, কাজ কীরকম এগুচ্ছে, তাই দেখবার জন্য। তাছাড়া, কোন কিছুতেই

হস্তক্ষেপ করেন না, যা-কিছু দেখাশোনা, অগস্টের উপরেই ভার।

এক নেশা কাপ্তেনের, ঘুর-ঘুর করে বেড়িয়ে বেড়ানো। গ্রামের রাস্তা, পাহাড়ের নীচে জলা, জলার ওপারে বনভূমি, সর্বত্র তিনি যাচ্ছেন। যে-জায়গা ভাল লাগছে, দশবারও যাচ্ছেন সেখানে। ঐ বনটা তাঁর ভারী প্রিয়। ওখানে ছোট ছোট ঝাড়ে বৈঁচি-ফল পেকে পেকে আছে অগুন্তি। গাঁয়ের ছেলেরা কেউ যায় না সে-বনে, ঐ জলাটাকে তারা ভয় পায়। ছেলেরা যায় না, কাজেই অমন সুস্বাদু বৈঁচিগুলোও তোলে না কেউ।

এখন স্ক্যারোর বরাতের ফের—বৈঁচি ফল তিনি বড্ডোই ভালবাসেন। সেই ছেলেবেলা থেকেই। পাহাড়ের মাথায় উঠে তিনি যেদিন প্রথম দেখলেন জলার ওধারে বিস্তীর্ণ বনভূমিটা. সেই দিনই তিনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন—"কী আছে ঐ বনে ?"

পাশে দাঁড়িয়েছিল এ্যান-মেরায়া, কেরোলাসের বৌ। সেই এ্যান-মেরায়া, বছর চার পাঁচ আগে জোচ্চোর আর্মেনিয়ান অর্গান-বাদককে যে নতুন পশমী মোজা দিয়ে দিয়েছিল করুণার বশে। এ্যান-মেরায়া জবাব দিল—"ওখানে পাওয়া যায় অঢেল বৈঁচি। যেমন বড, তেমনি মিষ্টি"

"আমায় তুলে দেবে ?"—ছোট ছেলের মত আবদার ধরলেন স্ক্যারো।

"আমি কখন যাব ?"—হেসে এড়িয়ে গেল এ্যান-মেরায়া—"গেলে আপনারই কাজে কামাই পড়বে। অগস্ট আমায় পুরো মজুরি দেবে কি তা হলে ?"

তা বটে! স্ক্যারো আর অনুরোধ করলেন না তাকে। পয়সা দিয়ে মজুর খাটানো হচ্ছে, সে-মজুরকে দিয়ে বৈঁচি তোলানো যেমন হবে হাস্যকর, তেমনি হবে অন্যায়। অন্যায় এই জন্য যে পয়সাটা স্ক্যারোর নয়, তাঁর মালিকের। মাছের ব্যবসায়ী যিনি, তাঁর।

স্ক্যারো পদমর্যাদায় কাপ্তেন হলেও কার্যত সেই মালিকের বেতন-ভোগী কর্মচারী ছাড়া অন্য কিছু নন !

অথচ বৈঁচির লোভ দমন করাও যায় না। অগত্যা নিজেই চলে যান জলার ধার দিয়ে দিয়ে বন পর্যন্ত, অনেক ঘুরে ঘুরে, মাঝে মাঝে জলকাদাও ভেঙ্গে ভেঙ্গে যেতে হয় সেখানে। কিন্তু একবার গিয়ে পৌঁছোতে পারলে—উঃ! কত যে পাকা-পাকা, রাঙ্গা-রাঙ্গা, ইয়া ইয়া মস্ত মস্ত বৈঁচি, যেমন রসালো, তেমনি মিষ্টি, পেট ভরে খেয়ে আবার পকেট ভরে নিয়ে আসেন স্ক্যারো।

প্রায়ই যান স্ক্যারো বৈঁচি খেতে।

একদিন জলার ধার দিয়েই যাওয়ার জন্য পা বাড়িয়েছেন, হঠাৎ তাঁর নজরে পড়ল একটা জিনিস। জলার বুকের উপরে এপার থেকে ওপার পর্যন্ত বড়-বড় পাথর সাজানো রয়েছে। ঠিক গায়ে গায়ে নয়। এক ফুট দেড় ফুট তফাতে তফাতে। যে-কোন বয়স্ক লোকের পক্ষে সেই সব পাথরে পাথরে পা ফেলে ফেলে ওপারে পৌঁছোনো কিছুমাত্র শক্ত নয়। একটু হুঁশিয়ার হতে হবে, পা যেন ফসকে না যায়। ফস্কায় যদি, জলার কাদাজলে হাবুডুবু খেতে হবে। দামী জামাজুতো নোংরা হয়ে যাবে একেবারে।

তা, হুঁশিয়ার হওয়ার বাধা কী ?

রাস্তা অনেকটা সংক্ষেপ। আর রাস্তাটা পরিচ্ছন্নও। নোংরা জলের উপরে উঁচু হয়ে আছে যে-পাথরগুলো, তাদের মাথা ধবধব করছে সাদা। ওদিকে জলার ধারের রাস্তা, ডাঙ্গায় ডাঙ্গায় তা দিয়ে হাঁটা যায় নিশ্চয়ই, কিন্তু সে-ডাঙ্গা কাদায় ভর্তি। হাওয়াতে ঢেউ ওঠে জলায়. অনেকদূর পর্যন্ত ভিজিয়ে দেয় তীরভূমিকে। যেখানে ঢেউ পৌঁছায় না, সেখানে দুর্ভেদ্য কাঁটাবন।

সাত-পাঁচ ভেবে নিয়ে পাথরের সেতুবন্ধ দিয়েই যাত্রা করলেন স্ক্যারো, বেশ সাবধানেই তিনি পা ফেলবেন, তাড়াতাড়ি করবেন না।

মাঝামাঝি জায়গায় পৌঁছে গিয়েছেন স্ক্যারো। একখানা পাথর থেকে পা তুলে দিয়েছেন অন্য একখানাতে। এমন ত্রিশখানা

পাথর তিনি পেরিয়েই এসেছেন ইতিমধ্যে। নির্বিঘ্নে, নিরাপদে, স্বচ্ছন্দে। হঠাৎ এই একত্রিশ নম্বরের পাথরখানা—

তার উপর স্ক্যারোর পা পড়া-মাত্র একেবারে ডিগবাজি খেয়ে উল্‌টে গেল। আর তার উপর থেকে স্ক্যারো পড়ে গেলেন জলার কাল্‌চে নোংরা, দুর্গন্ধ জলে।

এঃ! প্রথমটা যে-ভাব মনে উদয় হলো স্ক্যারোর, তা একটা অবিমিশ্র, অপরিসীম ঘৃণার। আরে ছিঃ ছিঃ, কী বিড়ম্বনা! জামাজুতো তো গেলই, সারা গায়ে এই নরকের ক্লেদ মাখামাখি— ছিঃ ছিঃ, সাবান ঘষলেও এ-গন্ধ কতদিনে যাবে না, কে জানে!

জলা তো গভীরও বটে! স্ক্যারোর পা তো মাটি স্পর্শ করছে না! উপরন্তু পা তিনি নাড়তেই পারছেন না তো! তাঁর পায়ের নীচে, তাঁর দেহের চারিদিক ঘিরে. এ যা থলথল করছে, তা জল নয়, কাদা। কাদার দহ একটা। তিনি তলিয়ে যাচ্ছেন ধীরে ধীরে। এ-কাদা তাঁকে যেন অক্টোপাশের মত ছেঁকে ধরেছে। ঐ যে পাথরখানা, যার উপর শেষবার শক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন তিনি, সেটা ঐ যে! তাঁর নাগালের একটুখানি, সামান্য একটুখানি বাইরে, সামান্য একটু। কিন্তু সেইটুকু দূরত্ব হেঁটে বা সাঁতরে তিনি কিছুতেই পেরুতে পারছেন না, নড়ছে না, পা তাঁর নড়ছে না। নড়ছে না। দু'খানা পা শুধু তাঁর নেমে যাচ্ছে নীচুপানে, অতল কাদার মরণফাঁদে।

এইবার স্ক্যারো ভয় পেয়েছেন। তিনি আর্তনাদ করে উঠলেন। কেউ শুনতে পেলো না। আজ রবিবার, গ্রামের সব লোক এসময় গির্জায়। যত চীৎকারই করুন, সে-আওয়াজ পৌঁছোবে না সেখানে। ঐ তো নিকটেই পাহাড়। অন্য দিন একশো লোক এসময়ে তাঁরই মাছ শুকোতে ব্যস্ত থাকে ঐ পাহাড়ের মাথায়। থাকলে তারা নিশ্চয় শুনতে পেতো তাঁর আর্তনাদ, দলে দলে দৌড়ে আসত তাঁকে উদ্ধার করবার জন্য। কত সহজ হতো সে-উদ্ধার! এক গাছা দড়ি

বা একখানা কাঠ ফেলে দিলেই স্ক্যারো রক্ষা পেয়ে যেতেন। কিন্তু না, আজ কেউ নেই দড়ি বা কাঠ ফেলে দিতে।

অবিরাম চীৎকার! ধারাবাহিক আর্তনাদ! ক্রমশঃ কাদার দহে তলিয়ে গেলেন স্ক্যারো।

৫

এ্যান-মেরায়া কি গির্জা থেকে সকাল সকাল বেরিয়ে পড়েছিল সেই রবিবারে ? আর বেরিয়ে পড়েই কি সে জলার ধারে এসেছিল সেদিন ? কী যে করেছিল সে, আর কী যে করে নি, তা স্পষ্ট ভাবে কোনদিনই তার মুখ থেকে কেউ শুনতে পায় নি ঐ মর্মান্তিক দুর্ঘটনার পরে।

যা গ্রামসুদ্ধ লোক জানে. তা হলো এই যে গির্জার উপাসনা প্রায় শেষ হতে চলেছে সেদিন, এমন সময়ে ভূতে-পাওয়া মানুষের মত চ্যাঁচাতে চ্যাঁচাতে গোঙাতে গোঙাতে এ্যান-মেরায়া ছুটে এসে পড়েছিল গির্জায়। মুখে তার এক বুলি, "জলার দহে ডুবে গেল কাপ্তেন ! জলার দহে ডুবে গেল কাপ্তেন !"

বলাবাহুল্য, গির্জাসুদ্ধ লোক তাই শুনে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে এসেছিল জলার ধারে। এসে তারা কাপ্তেনের কোন চিহ্ন কোথাও দেখতে পায়নি, স্ক্যারো তখন কাদার দহে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছেন একেবারে। স্ক্যারোকে দেখতে পেলো না কেউ, তবে তার ঘড়িটা, আর পয়সাকড়ির ব্যাগটা পাওয়া গেল ডাঙ্গায় কূলের কাছে, শেষ-মুহূর্তে প্রাণপণ শক্তিতে তিনি সে-দুটোকে ছুঁড়ে মেরেছিলেন কূলে।

ঠিক কোন্ জায়গায় যে তলিয়ে গিয়েছেন তিনি, তাও ঠিকই অনুমান করল গ্রামবাসীরা। কারণ পাথরের লাইনের ভিতরে এক জায়গায় একখানা পাথর উল্টে ছিটকে গিয়েছে লাইন-ছাড়া হয়ে। কী কারণে ওটা গেল ছিটকে, তাই বা বলবে কে ? এ-জলার সবই তো রহস্যময়, সবই তো বিভীষিকায় ঘেরা !

কোথায় ডুবেছেন স্ক্যারো, আন্দাজ একটা পাওয়া যাচ্ছে বটে। কিন্তু সেখান থেকে তাঁকে তুলতে যাওয়া তো ঘোর বিপজ্জনক ! একজনকে তুলতে গিয়ে আরও দুই একজনের কর্দমসমাধি হোক, এটা কেউ পছন্দ করল না। বিশেষ, যাকে তোলার কথা হচ্ছে,

সে যখন নিশ্চয়ই মরে গিয়েছে। একটা মৃতদেহ (তাও আবার বিদেশী নিঃসম্পর্কীয় একজনের) তুলতে গিয়ে জ্যান্ত দুই একজনও মৃত্যুমুখে পতিত হয় যদি, বুঝতে হবে গ্রামসুদ্ধ লোকের মতিচ্ছন্ন হয়েছে।

ও-চেষ্টায় দরকার নেই, সবাই একমত।

একমত নয় কেবল এ্যান-মেরায়া। সে যেন কেমন একরকম হয়ে গেল স্ক্যারোর অপমৃত্যুর পরে। সেই যে স্ক্যারো তাকে অনুরোধ করেছিল বৈঁচি এনে দেবার জন্য, সেই যে সে অস্বীকার করেছিল বৈঁচি তুলতে কাপ্তেনের জন্য, সেই ব্যাপারটাই সদাসর্বদা মনে জাগে তার। সে যদি এনে দিত তাকে বৈঁচি, কিংবা সে যদি তাকে সাবধান করে দিত যে জলার ভিতর দিয়ে পাথরে পা ফেলে ফেলে কাপ্তেন যেন একা একা কখনো পেরুবার চেষ্টা না করে, তাহলে তো হতো না এ-সর্বনাশ!

এ্যান-মেরায়া কেমন যেন পাগলের মত হয়ে যাচ্ছে। কেউ কিছু শুনতে পাচ্ছে না, অথচ এ্যান-মেরায়া প্রায়ই সকালবেলায় একটা নির্দিষ্ট সময়ে জলার দিক থেকে শুনতে পায় একটা আর্ত-চীৎকার। একটা? না, একটা নয়। একের পরে এক, ক্রমাগত চীৎকার আসতে থাকে 'বাঁচাও, বাঁচাও' বলে। কানে আঙুল ভরে দিলেও সে-ভুতুড়ে আর্তনাদ ঢুকবেই ঢুকবে এ্যান-মেরায়ার কানে।

এদিকে এক জাহাজ মাছ শুকোচ্ছে পল্‌ডেনের পাহাড়ে, তার কী হয়? স্ক্যারো আর অগস্ট, এছাড়া কোন লোকই তো ছিল না "সী-গাল" জাহাজে। আগের লোকদের লোফোটেন থেকেই বিদায় দিয়ে এসেছিলেন স্ক্যারো। পল্‌ডেনে যতদিন থাকা হবে, ততদিন মেট-মাল্লার তো কাজই নেই কিছু জাহাজে। মাঝে মাঝে ঝাঁট-পাট দেওয়া, তার জন্য ঠিকে লোক পল্‌ডেনে ঢের মিলবে।

কাজেই, স্ক্যারো যখন চলে গেলেন, তখন অগস্ট ছাড়া জাহাজে কেউ নেই আর। তবে অগস্ট ঘাবড়াবার ছেলে নয়। স্ক্যারো নেই বটে, কিন্তু জাহাজের কাগজপত্র সবই আছে। আর নগদ

তহবিল যেটা স্ক্যায়োর পকেটে পকেটেই থাকত সারাক্ষণ, সেটাও রক্ষা পেয়েছে স্ক্যায়োর উপস্থিত বুদ্ধির দরুন। মরণ কালেও ব্যাগটা তিনি ছুঁড়ে ফেলে দিতে ভোলেননি কূলের দিকে। অর্থটা নষ্ট হলে কাজও কাজে কাজেই বন্ধ হয়ে যেত।

ব্যাগ হাতে পেয়েই কেরোলাস-প্রমুখ মাতব্বর লোকদের সামনেই সেটা খুলে ফেলল অগস্ট। তাদের সামনেই গুণে ফেলল অর্থটা, হাজার ডলারের উপরেই রয়েছে ব্যাগে। অগস্টের একটা আন্দাজ আছে, ঐরকম পরিমাণের অর্থই এখন দরকার, কাজ শেষ করে জাহাজখানা বার্জেন পৌঁছে দিতে হলে। বার্জেন! কারণ, জাহাজের যাঁরা মালিক, তাঁরা বার্জেনেরই লোক। খাতাপত্র থেকে তাঁদের ঠিকানা উদ্ধার করে অগস্ট ইতিমধ্যেই স্ক্যায়োর আকস্মিক মৃত্যুর সংবাদ পৌঁছে দিয়েছে তাঁদের কাছে। একথাও লিখেছে যে কাজ শেষ করে অচিরেই সে জাহাজ নিয়ে রওনা হতে পারবে বার্জেনে।

ব্যাগটা পাওয়ার পরে আরও একটা চিঠি অগস্ট লিখল তাঁদের কাছে।

মাছ-শুকোনোর কাজে আগে একটা আনন্দের আমেজ ছিল। ছিল একটা স্ফূর্তি, একটা মৃদু উত্তেজনা। সকলের পক্ষেই লাভজনক কাজ তো!

কিন্তু স্ক্যায়োর শোকাবহ মৃত্যু সেই আনন্দের পরিবেশটাকেই নষ্ট করে দিয়ে গিয়েছে। এখন যে কাজ করে যাচ্ছে লোকে, সে শুধু এই জন্য যে শেষ না করলেই নয় এই ব্যাপারটা। আসে সবাই, যে যার কাজে লেগে যায় নিঃশব্দে। কথা কওয়ার দরকার যখন হয়ই, চুপিচুপি কয় তা, অকারণে হাঁক পাড়ে না আগের মত। আর, একটা অদ্ভুত বাতিকে পেয়ে বসেছে সবাইকে। কাজ করতে করতে হঠাৎ এক একবার ঘাড় ফিরিয়ে পিছনপানে তাকায়। সেই অলক্ষুণে জলার দিকে। কেমন যেন মনে হয় তাদের। জলা থেকে একটা আর্তনাদ ভেসে আসছে হাওয়ায় ভর করে।

তবে না, প্রত্যেকেই স্বীকার করে, সেটা তার মনের ভুল।

প্রত্যেকেই, কেবল এক এ্যান-মেরায়া ছাড়া। সে এখনও জোরগলায় বলে যাচ্ছে, স্ক্যারোর আর্তনাদ এখনো সে প্রত্যহ শুনতে পায় জলার দিক থেকে—"বাঁচাও, বাঁচাও"—বুকফাটা হাহাকার। শিউরে উঠে এ্যান-মেরায়া, দুই কানে আঙ্গুল ঢুকিয়ে দিয়ে ছুটে পালায় এক দিকে। গ্রামের লোক কেরোলাসকে পরামর্শ দিচ্ছে—লোফোটেন নিয়ে ওকে ডাক্তার দেখাও, দরকার হলে পাগলা গারদে পাঠাও।

এই মাছের কাজটা মিটে গেলেই হয়ত যাবে কেরোলাস লোফোটেন।

সে-কাজ একদিন মিটল। পাহাড়ের মাথায় আর মাছ নেই। সব মাছ আবার জাহাজের খোলে ফিরে এসেছে। পরিষ্কার করে, শুকিয়ে, গাদায় গাদায় সাজিয়ে রেখেছে মজুর আর মজুরনীরা।

অগস্ট একদিন বসে প্রত্যেকটা লোককে তার পাওনাগণ্ডা মিটিয়ে দিল। রসিদ নিল প্রত্যেকের কাছে। সই করতে বড়-কেউ পারে না, আঙ্গুলের টিপ দিল প্রত্যেকেই। তার নীচে গাঁয়ের মোড়ল কেরোলাসের সই।

সব যখন মিটল, অগস্ট বলল এডভার্টকে—"তুমি চল আমার সঙ্গে। বার্জেন পৌঁছে দিয়ে আসি জাহাজ।"

"বার্জেন? আমি সে-রাস্তা চিনি না তো!"—বলল এডভার্ট।

"চিনি না আমিও"—জবাব দিল অগস্ট—"কিন্তু জাহাজে চার্ট আছে, কম্পাস আছে। সেই সব দেখে দেখে জাহাজ আমি ঠিক চালিয়ে নিয়ে যেতে পারব। আমি কি মিছেই সাত-সমুদ্দুর ঘুরেছি? জাহাজ চালাতে জানি আমি।"

"সত্যিই কি সাত-সমুদ্দুর ঘুরেছ তুমি?"—হেসে ফেলল এডভার্ট—"স্টকমার্কনেস মেলায় যাওয়ার সময় যেভাবে নাস্তানাবুদ হয়ে পড়লে তুমি সেবার, আমার তো মনে হয়েছিল—জীবনে কখনো সমুদ্দুরে বেরোওনি তুমি।"

অবজ্ঞায় ঠোঁট উল্‌টে দিয়ে অগস্টা বলল—"সমুদ্দুরে বেরুনো মানেই হলো জাহাজে বেরুনো। নৌকোয় কেউ সমুদ্দুরে যায় না।

আমিও যাইনি। আরে ছিঃ। সমুদ্দুরে নৌকো? যার উপরে সোজা হয়ে দাঁড়ানো যায় না? কেরোলাসের নৌকোয় আমার যে-মূর্তি দেখেছ, তার থেকে একেবারে আলাদা রকম মূর্তি দেখতে পাবে "সী-গালে"। হাজার হলেও জাহাজ হলো জাহাজ। নৌকো কিছু না। একদম কিছু না।"

অগস্ট কাপ্তেন। এডভার্ট মেট। আর মাল্লা বলতে একটা ছেলে, থিয়োডোর তার নাম, বছর পনেরো বয়স. হার্নিয়ার রোগী। গাঁয়ের অন্য কোন ছেলে রাজী হলো না যেতে। তারা এবারে বেদম খেটেছে। অন্য অন্য বছর, লোফোটেন থেকে মাছ ধ'রে ফিরে-আসার পরেই তাদের শুরু হয় একটানা বিশ্রাম। সেই পরের সাল আবার মাছ-ধরার মরশুম শুরু হওয়ার আগে পর্যন্ত। পেটে রুটি থাকুক বা না-থাকুক, নাচ-গান-ফূর্তির অঢেল সুযোগ থাকে তাদের। এবারে সেইখানে, ধর গিয়ে, লোফোটেনে আর কী খাটনি! সেখানে থেকে ফিরে এসে তারা পড়ে গেল স্ক্যারোর জাঁতাকলে। একবার পাহাড়ে ওঠো, একবার পাহাড় থেকে নামো। বাপ্! চলল তিনমাসের উপর! তার পরেও আবার? মানুষের দেহ কি লোহা দিয়ে তৈরী, ভেবেছে অগস্ট? হবে না। এবারে পল্‌ডেনবাসীদের আরামের পালা।

একমাত্র ঐ হার্নিয়ারোগী থিওডোর ছেলেটা, কী-জানি-কী মনে করে রাজী হয়ে গেল। ত্রিসংসারে কেউ নেই, অথচ সংসার পাতবার ঝোঁক ওর প্রচণ্ড। আর সংসার পাততে হলেই পয়সার দরকার। এখন এই পনেরো বছর বয়স তার। এখনই স্বাবলম্বী ও। খেটে যদি যেতে পারে, এই হার্নিয়া যদি তাকে মাঝপথে গ্রেপ্তার করে যমালয়ে না পাঠিয়ে দেয়। বছর কুড়ি বয়স যখন হবে, ও হয়ত একখানা কুঁড়ে বেঁধে তার ভিতরে একটা রাঙ্গা-চোঙ্গা বৌ এনে তুলতে পারবে। পয়সা-কামানোর কোন সুযোগই অবহেলা করবে না থিয়োডোর।

"সী-গাল" ছাড়ল। ছাড়বার আগে অগস্ট গির্জার পাদরি

আগষ্ট ক্ষেপে উঠলো—“আমি ক্যাপটেন আমার হুকুম মানতে হবে।”

সাহেবের হাতে একটা ডলার দিয়ে বলল—"কাপ্তেন স্ক্যারোর আত্মার সদ্গতির জন্য একটা বিশেষ উপাসনার বন্দোবস্ত করবেন এই দিয়ে।"

জাহাজ ছাড়ল।

অগস্টের চালিয়াতি দেখে দেখে এডভার্ট মুখ ফিরিয়ে ফিরিয়ে হাসে শুধু। ও যেন সত্যি সত্যি কাপ্তেন বনে গিয়েছে রাতারাতি। নাম ধরে আর সে ডাকে না এডভার্টকে বা থিয়োডোরকে। একজনকে বলে মেট, অন্যজনকে কিছু হুকুম করতে হলে বলে—"অল হ্যাণ্ডস" অর্থাৎ সবাই হাত লাগাও। কাপ্তেনের কেবিনে ম্যাপ নিয়েই বসে আছে প্রায় সময়। যখন তা থাকছে না, তখন লম্বা লম্বা পা ফেলে পায়চারি করছে ডেক-এর এমাথা থেকে ওমাথা, কদাচিৎ-বা দূরবীন হাতে নিয়ে উঠে যাচ্ছে মাস্তুলের ডগায় সেই খাঁচাটাতে, যাকে নাবিকেরা বলে কাকের বাসা।

তবে একথা ঠিক, অগস্টের এ এক নতুন মূর্তি। মেলার পথে যে ভয়ার্ত ছোকরা নৌকোর খোলে পড়ে হড়হড় করে বমি করেছিল ঘণ্টায় ঘণ্টায়, সে এখন সমুদ্দুরের বুকে আথাল-পাথাল ঢেউ দেখেও ভয় পাচ্ছে না বা সেই ঢেউয়ের দোলানি খেয়েও অস্বস্তিবোধ করছে না।

তবে হ্যাঁ, জাহাজ বাহির সমুদ্রে কদাচিৎই যাচ্ছে, নরওয়ের কূল ঘেঁষে ঘেঁষে চলে যাচ্ছে বরাবর দক্ষিণে। হাওয়া অনুকূল, পাল খাটানো আর পাল গুটোনো, এ-ছাড়া কাজই নেই কিছু। সেকাজ এডভার্ট আর থিয়োডোর পালা করে করে মসৃণ ভাবেই চালিয়ে যাচ্ছে।

ফ্যালো! একটা ছোট্ট জায়গা। সমুদ্রে ঢুকে গিয়েছে সরুপানা অন্তরীপ। তারই মাথায় জাহাজগুলো থামতে পারে। যদিও ডাঙায় উঠতে গেলে নৌকার সাহায্য না নিয়ে উপায় নেই। অথচ একটা স্টিমার লাইন নিয়মিত স্টিমার চালায় এপথে, ঐ অন্তরীপই স্টেশন তাদের। এক মাইল দূরে ঘন বসতি চোখে পড়ে ফোসেনল্যাণ্ডের। সেখানে বড় বড় বাড়ী কল-কারখানার চিমনি, ফ্যালোর

তুলনায় অনেক বড় জায়গা। ওখানে কেন ভেড়ায় না এই স্টিমারগুলো ?

যা হোক, সী-গাল ফ্যালোতেও ধরবে না, ফোসেনল্যাণ্ডেও না।

এই কথারই আলোচনা হচ্ছে সেদিন হালের ধারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। একটা হাত চাকায় রেখে এডভার্ট বলছে—"বার্জেন পৌঁছে যাদের জাহাজ তাদের হাতে তুলে দিতে পারলে গোজন্ম উদ্ধার হয় আমাদের।"

"তুলে যদি না-ই দিই তো কেমন হয় ?"—হঠাৎ হুম্ করে প্রশ্নটা অগস্ট ছুঁড়ে মারল একটা বোমার মত।

এডভার্ট চমকে গেল—"ও আবার কী কথা ? তুলে দেব না তো পরের জাহাজে ভূতের ব্যাগার খাটব নাকি চিরদিন ?"

"ভূতের ব্যাগার খাটব কেন ?"—অগস্ট বলল অন্যদিকে তাকিয়ে—"নিজেদের কত কাজই তো করে নিতে পারি এই জাহাজখানা হাতে থাকলে। শুধু জাহাজই বা কেন, জাহাজ-ভর্তি কড মাছ। বার্জেন না গিয়ে ধর যদি আমরা বরাবর দক্ষিণে চলে যাই, উত্তর সাগর পেরিয়ে, চ্যানেলের ভিতর দিয়ে, বিস্কের ঝোড়ো উপসাগরকে কলা দেখিয়ে, আমরা যদি স্পেন পর্যন্তই চলে যাই, ক্ষতিটা কী হয় ? কড মাছের বিস্তর চাহিদা ওদিকে, মাছের বদলে সোনায় ভরে যাবে জাহাজ। তারপর আটলান্টিক পেরিয়ে আমেরিকায় চলে যাই যদি, কিংবা বরাবর দক্ষিণ, দক্ষিণ আরও দক্ষিণ, করতে-করতে কেপ টাউনে গিয়ে নোঙ্গর ফেলি যদি, কী হয় তাহলে ? জায়গাজমি আমেরিকা, আফ্রিকা, দুই মহাদেশেই বিনা পয়সায় মেলে। আমাদের তো অঢেল পয়সাই আছে! জমিদার হয়ে যাব আমরা। ইংরেজ সরকার লর্ড-উপাধি দেবে খোসামোদ করে।"

এডভার্ট এমন হাঁ করে ফেলেছে ততক্ষণ, গোটা জাহাজটাই বোধ হয় ঢুকে যায় তার ভিতর।

"থিয়োডোরটাকে নিয়ে অবশ্য সমস্যা আছে একটা"—নিজের মনেই যেন বলে যাচ্ছে অগস্ট—"তা সে-সমস্যা-সমাধানের ভার

আমার উপরেই রইল। নর্থ সী'র মাঝামাঝি সমুদ্রে ফেলে দেব এক ধাক্কা দিয়ে।"

আর সহ্য করতে পারল না এডভার্ট, সে চেঁচিয়ে উঠল। বেশ কড়া মেজাজেই চেঁচিয়ে উঠল—"কী আবোল-তাবোল বকছ তুমি? ওসব কথা শুনলেও পাপ। আমরা বার্জেনে জাহাজ ভেড়াচ্ছি। যাদের জাহাজ তাদের হাতে তুলে দিয়ে নিশ্চিন্দি হচ্ছি।"

"কোথায় পাবে বার্জেন? বার্জেন আমরা কখন ফেলে এসেছি পিছনে।"—এতক্ষণে চোখে-চোখে এডভার্টের দিকে চাইল অগস্ট।

"ফে-লে এসেছি?"—এডভার্ট স্তম্ভিত একেবারে। অগস্ট তাহলে বেশ ভেবে-চিন্তেই এই নরকের পথে অগ্রসর হতে চাইছে? মানুষ চেনা যায় না।

কিন্তু অগস্ট যেতে চাইলে হবে কী? এডভার্ট যাবে কেন? নিজেও সে যাবে না নরকের পথে, যেতে দেবে না অগস্টকেও। সে দৃঢ়স্বরে বলল—"বার্জেন পিছনে ফেলে এসেছি? এসে থাকি যদি, জাহাজ ঘোরাব এক্ষুণি, ফিরে যাব বার্জেনে।"

অগস্ট ক্ষেপে উঠল যেন—"আমি কাপ্তেন, আমার হুকুম মানতে হবে।"

এডভার্ট ক্ষেপেনি। সে সংযতভাবেই বলল—"তুমি কাপ্তেন হতে পার, কিন্তু আমি বোম্বেটে নই"

পাল নামিয়ে ফেলে এডভার্ট জাহাজের মুখ ঘোরাচ্ছে ততক্ষণে। চ্যাঁচামেচি শুনে থিয়োডোর খোল থেকে উপরে উঠে এসেছে। এদিকে ওদিকে চাইছে সে। অগস্টে আর এডভার্টে ঝগড়া? কোনদিন দেখেনি, কোনদিন তা সম্ভব বলেও ভাবেনি।

জাহাজ ঘুরছে উত্তর মুখে। অগস্ট শেষ কামড় দিল এই বলে —"একটা পিস্তল যদি থাকত পকেটে, মিউটিনির সাজা কী করে দিতে হয়, হাতে হাতে দেখিয়ে দিতাম।"

এডভার্ট কান দিল না সে-শাসানিতে। অগস্ট গটগট করে কেবিনে গিয়ে ঢুকল।

৬

সী-গাল জাহাজের মালিকেরা লোক খুব সরল নন। মাছের চালান এবং হিসাবপত্র নিয়ে অনেক বেগ দিলেন তাঁরা অগস্টকে। এত কম অর্থ ফিরল? অগস্ট শেষ ফার্দিংটি পর্যন্ত হিসাব পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিচ্ছে তাঁদের। তবু তাঁদের সন্দেহ মেটে না। এই সন্দেহ যে মবলগ পয়সাকড়ি হাতে পেয়ে এই ছোকরা অবশ্যই বিলক্ষণ কিছু আত্মসাৎ করে থাকবে তা থেকে।

যা হোক, হিসাবে কোন কারচুপি তাঁরা বার করতে পারলেন না। "ঠিক-ঠিক বুঝে পেয়েছি" বলে রসিদ তাঁদের দিতেই হলো লিখে।

বলা বাহুল্য, উদ্বৃত্ত অর্থ মালিকদের হাতে ফেরত দেবার আগেই অগস্ট তা থেকে নিজের, এডভার্টের ও থিওডোরের হাত-নাগাদ সব-কিছু পাওনাগণ্ডা কেটে রেখে নিয়েছিল। তা না রাখলে ঐ কঞ্জুস মালিকদের কাছ থেকে সে-সব আদায় হওয়া সন্দেহেরই বিষয় ছিল।

যা হোক, অবশেষে দায়িত্ব থেকে রেহাই পেলো অগস্ট আর এডভার্ট। কাগজে কলমে এডভার্টের দায়িত্ব অবশ্য কিছুই ছিল না। কিন্তু নৈতিক দায়িত্ব ছিল। নৈতিক দায়িত্ব চেপে গিয়েছিল তার মাথায়, অগস্টেরই নীতিহীনতার দরুন। উপায় থাকলে অগস্ট যে মাছের পুরো চালানটা সমেত জাহাজখানা নিয়ে হাওয়া দিত দক্ষিণ আমেরিকা বা দক্ষিণ আফ্রিকার দিকে, তাতে এখন আর তিলমাত্র সন্দেহ নেই এডভার্টের। সেক্ষেত্রে এডভার্টও লোকতঃ ধর্মতঃ আইনতঃ অংশীদার হয়ে পড়ত তার অপরাধের। ভগবান রক্ষা করেছেন তাকে।

মালিকদের অফিস থেকে বেরিয়ে আবার দু'জনকে সী-গালে আসতেই হলো। সেখানে তাদের জিনিসপত্র তো রয়েছেই, তাছাড়া রয়েছে থিয়োডোরও। তাকে তো সঙ্গে নিতে হবেই!

আর সঙ্গে নেওয়া ! কে কাকে নেয় ?

জাহাজ থেকে নিজের ঝোলাটা নিয়েই অগস্ট বলল—"চললাম গো বন্ধু ! আমি রিগায় যাচ্ছি কিছুদিনের জন্য। "সোলগ্রাড" জাহাজে চাকরি নিয়েছি।"

এডভার্ট আকাশ থেকেই পড়ল যেন। এই তো সবে কাল তারা পৌঁছেলো বার্জেন। সন্ধ্যাবেলায় ঘণ্টাখানিকের জন্য একা একা "সী-গাল" থেকে নেমেছিল বটে অগস্ট, সেই এক ঘণ্টার ভিতরেই "সোলগ্রাডে" চাকরি যোগাড় করে ফেলল সে ?

খুব মর্মাহত হয়ে পড়ল এডভার্ট এই ব্যাপারে। অগস্টকে সে সত্যিই ভালবাসে। যত যা-ই বলা যাক, ছেলেটা কাজের ছেলে ! অসৎপথে না যায় যদি, অনেক উন্নতি করতে পারবে। তবে কথা এই, অসৎপথে যাওয়ার দিকেই প্রবল ঝোঁক ওর। এডভার্ট সঙ্গে থাকলে ওকে সামলে রাখতে পারত। যেমন সম্প্রতি একবার সামলেছে এই পরশু দিনই। কী আর করা যাবে ? ভগবানের যা ইচ্ছে, তাই হবে !

যাঃ, চাকরি একটা থিয়োডোরও পেয়ে গেল যে ! ট্রন্‌জেম যায় একখানা বজরা, তার দাঁড়ী একজন অসুখে পড়েছে। মোটেই দু'জন দাঁড়ী নৌকোতে, আর অবশ্য মাঝি একজন আছে। মাত্র দু'টো দাঁড়ীর পক্ষে উল্‌টো বাতাস ঠেলে উত্তরপানে বজরা এগিয়ে নিয়ে যাওয়া খুবই দুঃসাধ্য। তায় যদি আবার সেই দু'টো দাঁড়ীর মধ্যে একটা থাকে অসুস্থ, তাহলে তো বজরা নড়তেই চাইবে না !

এ-অবস্থায় এমন একটা লোক ঐ মাঝির দরকার, যে দাঁড় টেনে বজরাটাকে ট্রনজেম পৌঁছে দেবে, দিয়েই নেমে যাবে বজরা থেকে মজুরি বুঝে নিয়ে। তারপর বজরা তো মাল বোঝাই নেবে পাঁচ সাতদিন বসে। রুগ্ন দাঁড়ী ততদিনে অবশ্যই সেরে উঠবে।

খবরটা পাওয়া মাত্র থিয়োডোর গিয়ে প্রার্থী হলো ঐ চাকরির, বহালও হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে। এডভার্ট নিষেধ করবে কোন্ মুখে ? বাড়ী ফেরার পথে থিয়োডোর যদি বাড়তি কিছু রোজগার করায়

সুযোগ পায়, এডভার্ট কী করে বলে যে কাজ নেই ওতে? বললেই বা থিওডোর শুনবে কেন?

তিনজন বেরিয়েছিল পলডেন থেকে। দু'জনই ছিটকে পড়ল এধারে ওধারে। রইল বাকী একা এডভার্ট। ইচ্ছে করলে থিওডোরের সঙ্গী হিসাবে সেও বজরায় ঠাঁই পেতে পারত। কিন্তু সেটা তাঁর আত্মমর্যাদায় বাধল।

চলে গেল অগস্ট। চলে গেল থিয়োডোর। একা একা বার্জেনে ঘুরপাক খায় এডভার্ট। লোফোটেনের একটা জাহাজ বা বজরা তার দরকার। চাকরি পেলে ভালই। না-পেলে ভাড়া দিয়ে যেতেও অরাজী নয় সে।

কিন্তু না জাহাজ, না বজরা। ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ একদিন সে দক্ষিণ দিকে পা বাড়িয়ে দিল। এত কী তাড়া আছে ঘরে ফিরবার? বেরিয়ে যখন পড়া গিয়েছে, দুনিয়াটা এক চক্কোর ঘুরেই আসা যাক না! অগস্ট নানা দেশের গল্প করে। হয়ত বারো-আনাই মিথ্যে তার। তবু গল্প করার পুঁজি তার আছেই কিছু। এডভার্টেরও হোক না! সে অবশ্য মিথ্যে গল্প করবে না। বলতে জানলে সত্যি কথা বলেও চমক লাগিয়ে দেওয়া যায় লোকের।

এডভার্ট পা বাড়িয়ে ছিল দক্ষিণ পানে। সমুদ্রের ধারে ধারে সে হাঁটছে। এই তো চার পাঁচ দিন আগে ঐ নীল জলের উপর দিয়ে সে আর অগস্ট চালিয়ে নিয়ে গিয়েছিল সী-গালকে! আজ সী-গালও নেই, অগস্টও নেই। কিন্তু সমুদ্র আছে তেমনি নীল, তাতে ঢেউ ভাঙছে তেমনি সাদা। মন খারাপ করার কী আছে? চিরদিনের সাথী যদি পেতে হয় কাউকে, ঐ সমুদ্র, ঐ আকাশ, এই পাহাড় নদী ঝর্ণা, এরাই সেই চির সাথী। মানুষ কেউ চিরদিনের সাথী হয় না।

ফ্রোসেনল্যাণ্ড! অন্তরীপের ডগায় ইস্টিমার বেঁধে আছে, লোকজন মালপত্র ওঠানো নামানো হচ্ছে নৌকোর সাহায্যে। আর একটু এগিয়েই মস্ত কারখানাবাড়ী একটা সমুদ্রের উপরেই। মালিকের নাম শুনল, বেনক। মস্ত ব্যবসায়ী নাকি। নিজের

জাহাজ আছে দু'খানা। একখানা মাঝারি স্কুনার, আর একখানা ছোট স্লুপ। দুটোই নাকি মাছের কারবারে খাটে। লোফোটেনেই যায় মাছ কিনতে। কই, এডভার্টের চোখে তো পড়েনি কেনফের কোন জাহাজ! পরক্ষণেই সে নিজের বোকামি দেখে নিজে হেসে উঠল। সে কি নাম জানে কেনফের জাহাজের? হয়ত দেখেছে, চিনতে পারেনি কেনফের জাহাজ বলে। আর তাই বা কী কথা? কেনফ লোকটার অস্তিত্বের কথাও তো সে জানত না তখন!

রইল কেনফের কারখানা পিছনে পড়ে। এখনও দক্ষিণেই চলেছে এডভার্ট। পাহাড়ে পাহাড়ে পথ করে এগুনো, রীতিমত কষ্ট এ-অঞ্চলটাতে। অর্থাৎ ডাঙাপথে লোক এখানে চলেই না। ক্বচিৎ কদাচিৎ মানুষ যখন একজন দু'জন পড়ছে চোখে, নৌকাতেই পড়ছে তা। ডাকলে হয়ত তারা এডভার্টকেও নৌকায় তুলে নেয়। কিন্তু ডাকতে রুচি হয় না ওর। বেড়াতে বেরিয়েছে, একা বেড়ানোই ভাল।

একটা তুমুল জলকল্লোল শোনা যায়। সমুদ্রের ঢেউ-ভাঙার শব্দ নয়। এ এক নতুনতরো আওয়াজ। ঝরঝর ঝপঝপ। জল পড়ছে যেন বালতি থেকে। তবে সে-বালতিটা গেরস্তালি বালতির চেয়ে কোটি কোটি গুণ বড়। গেরস্তালি জলের ঝরঝর ঝপঝপের চেয়ে এর আওয়াজটাও তাই কোটি কোটি গুণ বেশী। হয়েছে! নরওয়ের লোক, জলপ্রপাত এ-যাবৎ চোখে না দেখে থাকলেও, তার গল্প তো অবশ্যই শোনা আছে। এ একটা জলপ্রপাতই বোধ হয়। এডভার্ট দাঁড়িয়ে পড়ল। কোন্‌দিকে প্রপাত?

এমন একটা জায়গায় সে দাঁড়িয়ে পড়েছে, যেখানে এডভার্টের ডাইনে সমুদ্র, বাঁয়ে বহুদূর একটানা চলে গিয়েছে এক অপরিসর গিরিশিরা। তার নীচে সমুখ দিকে একট. নাবাল উপত্যকা, সেখানে লোকালয়ের মতই কী-যেন দেখা যায় একটা। আর পিছন দিকে অতলস্পর্শ খদ।

"আমায় একটু সাহায্য করবেন ?"—অতি কাতর, অতি মধুর একটা স্বর হঠাৎ কানে এল এডভার্টের।

চমক ? দারুণ একটা চমক খেলো এডভার্ট। এখানে হঠাৎ এরকম বামাকণ্ঠের সম্ভাষণ সে শুনতে পাবে, এ তো স্বপ্নেরও অগোচর ছিল তার !

ঐ যে সেই বামা ! বাঁয়ের দিকে গিরিশিরার উপরেই, খদের ঠিক মাথাতেই দাঁড়িয়ে আছে। একটা নাতিবৃহৎ ঝোপের আড়ালে সে ছিল এতক্ষণ, হয়ত কুঁজো হয়ে বা হাঁটু গেড়ে বসে নীচুপানে নিরীক্ষণই করছিল কিছু। তাইতেই প্রথম নজরে এডভার্ট দেখতে পায়নি তাকে।

"আমায় একটু সাহায্য করবেন ?"—এ-অনুরোধ শুনলে কোন্ পুরুষ তাতে সাড়া না দিয়ে পারে ? বিশেষ করে সে-অনুরোধ যখন কোন সুন্দরী তরুণীর কাছ থেকে আসে ? দূরেই এখনও রয়েছে বটে মেয়েটি, একটা ঝোপের আড়ালও রয়েছে বটে মাঝখানে, তবু গোড়াতেই এডভার্টের কেমন যেন ধারণা জন্মে গিয়েছে, তার সাহায্য-প্রার্থিনী এই নারী কুশ্রীও নয়, বয়স্কাও নয়।

"আসছি আমি"—বলে দৌড়ে গেল এডভার্ট।

খুব মর্মান্তিক দরকারই হয়েছে বটে সাহায্যের। একটা ভেড়া—ত্রিশঙ্কুবৎ দোদুল অবস্থায় রয়েছে ঠিক মেয়েটির পায়ের নীচে।

না, দোদুল ঠিক নয়। ঝুলছে না ভেড়াটা। পায়ের নীচে তার শক্ত পাথরই আছে বটে। কিন্তু কতটুকুন পাথর সেটা ? ফুট দেড়েক চওড়া, ফুট তিনেক লম্বা। পাহাড়ের গা থেকে বেরিয়ে আছে ঐ আকারের একখানা সমতল পাথর। তার নীচে অতল খদ। সমুখে, ডাইনে, বাঁয়ে তিন দিকেই খদ। নড়বার জায়গা নেই বেচারা ভেড়ার, ঘুরবার তো নয়ই। কয়েকগাছা সবুজ ঘাস লকলক করছে সেই পাথরটার কিনারায়। পেটুক ভেড়া তারই লোভে উপর থেকে লাফিয়ে নেমেছে ঐ চাঙ্গড়টায়। এখন সে নড়তে পারছে না, ঘুরতে পারছে না। মাঝে মাঝে ব্যা-ব্যা করে এক একটা

করুণ আর্তনাদে মালিকনীকে ডাকছে সাহায্যের জন্য। মালিকনীই বা করবে কী? ভেড়াটাকে অনেকক্ষণ দেখতে পাওয়া যায়নি বলে খুঁজতেই এসেছিল সে। ঐ ডাক কানে গিয়েছিল বলেই পেয়েছে খুঁজে। তা নইলে—

না, তা নইলে ও-জায়গায় ওকে সে কখনোই পারত না আবিষ্কার করতে। আবিষ্কার করার পরে সে একেবারেই হতাশ এখন। ভেড়াটাকে যদি বাঁচতে হয়, তাকে ফিরে আসতে হবে পিছন দিকে। কিন্তু খদের দিকে মুখ রেখে পিছনে হেঁটে-আসার বিদ্যে যদি ভেড়াটার জানা থাকবে, তাহলে তো সে ভেড়া না হয়ে মানুষই হয়ে যেতো। ভয়ে কাঠ হয়ে আছে সে। ঠিক তার নাকের নীচেই অতল খদ। ডাইনেও তাই, বাঁয়েও তাই। ঠিক তার লেজের কাছেই মালিকনীর গলা সে শুনতে পাচ্ছে। কিন্তু সে মালিকনীও তাকে টেনে তুলছে না! ব্যাপার কী?

ব্যাপার এই যে, ওকে টেনে তোলা মালিকনীর অসাধ্য। একে ভেড়াটা যেখানে দাঁড়িয়ে আছে, সে-জায়গাটা অন্ততঃ দুই ফুট নীচু, মূল গিরিশিরার চেয়ে। সেখানে নেমে দাঁড়াবার জায়গা নেই মালিকনীর। কারণ জায়গা যেটুকু, তা ভেড়াই দখল করে রেখেছে। তাছাড়া, জায়গা থাকলেও ওখানে নেমে দাঁড়াতে সাহস পেতো না মেয়েটি। মাথা ঘুরে নিজেই পড়ে যেতো খদে। এ-অবস্থায় যা সে করতে পারত, তা চ্যাঁচামেচি। তা যে সে করেনি, সে শুধু এই কারণে যে জায়গাটা জনমনুষ্যহীন। নিকটতম লোকালয় প্রায় আধ মাইল এখান থেকে। কারেল পরিবারের বাড়ী। সুতরাং চেঁচিয়ে কোন লাভ নেই, এটা সে জানে।

ভেড়াটাকে বাঁচানোর কোন উপায় যে নেই, তা ভালরকম জেনেই সে একবার হতাশ চোখে এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখছিল, ঠিক তক্ষুণি তার চোখে পড়ে গেল—

যা দেখবার কোন আশাই সে করেনি, সেই জিনিস। অথবা, জিনিস তাকে বলা উচিত নয়, সে একটা আস্ত, জ্যান্ত, তাগড়া মানুষ।

প্রথমে তো নিজের চোখকে সে বিশ্বাসই করতে পারেনি। ভগবানের কি সত্যিই এতখানি দয়া হবে? এই ঘোর বিপদের সময় জনমানবহীন এই পাহাড়ে উদয় হবে একটা সমর্থ মানুষের?

মারগ্রেটা লেভিসা হাবাগোবা মেয়ে নয়। হতো যদি, একা এই পাহাড়ে জঙ্গলে বাস করতে পারত না একটি মাত্র শিশুসন্তান নিয়ে। মানুষ দেখেই সে ডাকল তাকে, সাহায্য চাইতে কুণ্ঠা বোধ করল না। ভেড়ার অবস্থা দেখে এডভার্ট তো ভেবেই অস্থির। ওখানে ঐ পাথরে নেমে ভেড়া তুলে আনা? রীতিমত বিপদের কথা! এডভার্টের নিজেরও প্রাণসংশয় হতে পারে তাতে!

তবু, প্রাণটা হাতে নিয়েই চেষ্টা করতে লাগল এডভার্ট। মারগ্রেটা নেমে গেল একটা মজবুদ দড়ি নিয়ে আসবার জন্য। সেই দড়িটা ভেড়ার গলায় বেঁধে দেওয়া হলো, উপর থেকেই। ফাঁস-গেরোর কায়দায়। দড়ির অপর প্রান্তটা আটকানো হলো সেই ঝোপে। তারপরে সেই দেড়ফুট চওড়া পাথরে, ভেড়ার ঠিক পাশটিতে নেমে দাঁড়ালো এডভার্ট।

এমন একটা সময় এলো, যখন অত-বড় ভেড়াটাকে উঁচু করে শূন্যে তুলতে হলো এডভার্টের। তাছাড়া, ওর মুখটা ঘোরাবার অন্য উপায় ছিলই না। সেই কয়েকটা মুহূর্ত। উঃ, এক ইঞ্চি যদি টলে যেত এডভার্টের দেহ, এক ইঞ্চি যদি সরে যেত তার পা, খদের অতলে পড়ে যাওয়া থেকে কেউ তাকে রক্ষা করতে পারত না। একাজ সে যে করতে পারল, তার কারণ শুধু এই যে সী-গালের কাকের বাসায় উঠে পালের দড়ি খাটানোতে অতি সম্প্রতিই সে হাত পাকিয়েছিল।

ভেড়া তুলে এনে পাহাড়ের মাথায় নির্জীবের মত পড়ে থাকতে হলো ওকে, বেশ কিছুক্ষণ। পরিশ্রমের চেয়ে উত্তেজনা গিয়েছে অনেক বেশী। মরণের সঙ্গে পাঞ্জা কষা যাকে বলে, ঠিক তাই সে করে এলো।

কতক্ষণ পরে মারগ্রেটাই ডেকে তুলল তাকে—"নীচে চল। তোমাকে একটু কফি খাওয়াব। যে-উপকার তুমি করলে—" .

শুয়ে ছিল এডভার্ট, সে উঠে বসল। তাকিয়ে দেখল মেয়েটির মুখের দিকে—"এখানে কি একা থাকো না কি তুমি?"

"না, একটি মেয়ে আছে। স্বামী ছিল, সে আমেরিকায় গিয়েছে। এই প্রায় চার বছর হলো। এখানে রোজগারের কোন পথ নেই তো!"

"রোজগারের পথ নেই? ফোসেনল্যাণ্ডে অত অত কারখানা দেখে এলাম! একটু এগিয়ে গেলেই বার্জেন, ট্রন্‌জেম! লক্ষ মানুষ করে খাচ্ছে তো! অবশ্য আমেরিকায় সুযোগ বেশী পায় লোকে। স্বায়ও সেইজন্যই। কিন্তু স্ত্রীকন্যাকে অসহায়া ফেলে একা একা চলে যায় না কেউ। সঙ্গেই নিয়ে যায় তাদের।"

সরল মানুষ, আবেগের মুখে অনেকগুলো কথা বলে ফেলে তারপর হঠাৎই চুপ করে গেল। মনে পড়েছে এতক্ষণে যে এসব কথা তার বলা ঠিক হয়নি, অনধিকারচর্চা হয়ে গিয়েছে। মস্ত কিছু উপকার সে করেছে বটে মারগ্রেটার, তা বলে তাইতেই তার ঘরোয়া ব্যাপারে মতামত প্রকাশের অধিকার নিশ্চয়ই জন্মায়নি।

"তুমি কিছু মনে করো না, আমি ভুলেই গিয়েছিলাম যে এসব কথা আমার বলা ঠিক নয়। কী বলছিলে? কফি? না, না, তার আর দরকার নেই। আমি দেশ দেখতে বেরিয়েছি। এইবার নিজের পথে রওনা হয়ে যাব।"

"একটু কিছু খেয়ে যাবে না? একটু কিছু?"—মারগ্রেটার মুখে ফুটে উঠল কাতর মিনতি।

"আচ্ছা, তাহলে চল—"

পাহাড়ের নীচে ছোট্ট বাড়ীটুকু। একখানা শোবার ঘর, একটু রান্নার জায়গা। পাথরের ঘর, কাঠের চালে পাথর সাজানো ছাদের আকারে। তার উপরে ঘাসের চাপড়া থাকে থাকে বসানো। বৃষ্টি যখন হয়, জলটা গড়িয়ে পড়ে যায় সেই চাপড়ার ওপর দিয়ে।

ঘর আরও একখানা আছে, একটু তফাতে। এটাতে একপাশে আছে খড়ের গাদা। অন্য পাশে থাকে আট দশটা ভেড়া। খড়? এই ডোপেন খামারের লাগোয়া জমি কিছু আছে। পাঁচ ছয় একর অন্ততঃ। কিন্তু তাতে আবাদ হয়নি কোনদিন, খড়ই হয় শুধু তাতে। জমিগুলো বড় বড় পাথরে ভর্তি। সে-সব পাথর যে শাবল কোদাল দিয়ে তুলে ফেলবে, তেমন মেহনতী মানুষ হাকন নয়।

"তোমার চলে কী করে? স্বামী যাওয়ার সময় পয়সাকড়ি দিয়ে গিয়েছে কিছু?"

মাথা নাড়ল মারগ্রেটা। "রোজগার-পাতি কোনদিনই কিছু করে না হাকন। সে থাকতেও সংসার আমাকেই চালাতে হত। কম্বল বুনি আমি।"

'কম্বল বোনো?"—বিস্ময়ের সীমা নেই এডভার্টের।

"ঐ যে ভেড়ার পাল। শীতের শেষে লোম-ছাঁটাইওয়ালারা আসে, খামারে খামারে ঘুরে সব ভেড়ার পশম কেটে দিয়ে যায়। আমার এক প্রস্থ যন্ত্রপাতি আছে। ঐ শোবার ঘরের মধ্যেই আছে। পশম আঁচড়াই, পরিষ্কার করি, রং করি, তারপর তাঁতে ফেলে কম্বল বুনি। ওটা আমার মায়ের কাছ থেকে শেখা আমার। আমার বাপের বাড়ী তো তাঁতীরই বাড়ী কিনা!"

শোবার ঘরে নিয়ে তাঁত দেখালো মারগ্রেটা। তাতে কম্বল একখানা জোড়াই রয়েছে। এডভার্টই অনুরোধ করল—"একবারটি দেখাও না, কী করে বুনতে হয়। আমি দেখিনি কোনদিন।"

হেসে তাঁতের পাশে বসে পড়ল মারগ্রেটা। ঠকাঠক, ঠকাঠক, চলতে লাগল তাঁত। এডভার্ট মন্ত্রমুগ্ধের মত তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে।

একটি পাঁচ ছয় বছরের মেয়ে এসে দাঁড়ালো মারগ্রেটার পিছনে। বিস্ফারিত চোখে দেখতে লাগল এডভার্টকে। সে খেলা করছিল কোথায় যেন, চারিদিকই তার চেনা-জায়গা, হারিয়ে যাওয়ার ভয় নেই।

"মার্জি, ঐ ছাখ্, তোর এক কাকা"—

নিজের নামেই মেয়ের নাম রেখেছে মারগ্রেটা। সংক্ষেপে তাকে মার্জি ব'লে। 'কাকা' শুনেই মার্জি টুক্ করে চলে এলো এডভার্ট-এর কাছে, তার হাত ধরে বলল—"তুমি কা-কা? এতদিন আসনি কেন? নাজনার কেমন কাকা আছে, আমার ছিল না এতদিন—তুমি আর যেও না, কেমন?"

যাওয়া সত্যিই হলো না এডভার্টের। অন্ততঃ সেদিন না। তার পরেও অনেকদিন না। প্রতিদিন সকালে উঠেই একটা-না-একটা কাজে হাত দেয় এডভার্ট। মনে মনে সংকল্প ঐ কাজটুকু শেষ করে দিয়ে, সেই দিনই সে বিকেল নাগাদ বিদায় নেবে এখান থেকে। ভাল হচ্ছে না এখানে থাকা। সে অবশ্য আরামে আছে খুব। ভেড়ার ঘরে, খড়ের গাদায় সে কম্বল বিছিয়ে শোয়। কোথা দিয়ে রাত কেটে যায়, টেরও পায় না।

অনেক কাজ সে করেছে এই খামারে। খদের উপরের গিরিশিরায় কিনারে কিনারে একটা বেড়া দিয়ে দিয়েছে, যাতে আর কোনদিন কোন ভেড়া সেখান থেকে নীচে নামার চেষ্টা না করতে পারে। খামারের জমিও খানিকটা পরিষ্কার করে ফেলেছে, পাথর তুলে, আগাছা উপড়ে। কিছু ফসল বুনে দেবে মারগ্রেটার জন্য। বার্লি হোক, মটর হোক—

ফসল বুনে দিয়ে তারপর সে পালাবে এখান থেকে। ফসল যখন পাকবে, পড়শী কারেলরা এসে তা কেটে দেবে, খানিকটা অংশ মজুরি বাবদ যদি পায়।

এডভার্ট তা বলে মারগ্রেটার কষ্টের রুটিতে ভাগ বসায় না। তার পয়সার তো অভাব নেই। সী-গালে চাকরি ছিল তার প্রায় ছয় মাস। পনেরো ডলার করে মাইনে তাকে দিয়েছিল অগস্ট। কম কথা নয়, নব্বুই ডলার। তা থেকে, বার্জেন থেকেই বিশ ডলার সে ডাকঘরের মারফত পাঠিয়ে দিয়েছিল বাবাকে। বাকী অর্থটা তো সঙ্গেই আছে তার। নিজের খাওয়া-পরার জিনিস সে

নিজেই কেনে। সঙ্গে সঙ্গে মারগ্রেটার বাজারটাও সে করে দেয়। তার দরুন পয়সা মারগ্রেটা দেয় ঠিকই। কিন্তু দশ সেণ্ট নগদ দিয়ে মাল সে কুড়ি সেণ্টের পাচ্ছে কিনা, অত সে হিসাব করে দেখে না।

কেনাকাটার জন্য ফোসেনল্যাণ্ডে কেনকের দোকানেই আসতে হয় এডভার্টকে। অনেক দূর, অনেক কষ্টের পথ। কিন্তু মনের আনন্দে অতদূরের পথ যেন বুনো হাঁসের পাখায় উড়ে আসে, উড়ে যায় এডভার্ট।

আনন্দেই সে আছে। তারই মাঝে—

হঠাৎ একবার কেনকের দোকানে, ম্যানেজার লোরেনসেন বলল—"ওহে এ্যাণ্ড্রিয়াসেন, তুমি না ডোপেন খামারে কাজ কর? এই একটা চিঠি আছে, মারগ্রেটা ডোপেনের। নিয়ে যাও—"

ও-তল্লাটের সব চিঠি ফোসেনল্যাণ্ডের কেনকের দোকানেই আসে। সেখান থেকে প্রাপকদের কাছে বিলি হয়, কোনটা এক মাস, কোনটা দুই মাস পরে। মারগ্রেটার চিঠিটাও প্রায় এক মাস ধরেই পড়ে আছে দোকানে।

চিঠি হাতে পেয়েই ঝোলার ভিতর ফেলে রেখেছিল এডভার্ট। নিজে তো ভাল পড়তে পারে না! চেষ্টাই করেনি পড়বার। ডোপেনে এসে দিয়ে দিল মারগ্রেটার হাতে।

আর চিঠি পড়েই আনন্দে চীৎকার করে উঠ মারগ্রেটা—"মার্জি! মার্জি! বাবা আসছে তোর! তোর বাবা আসছে।"

ফোসেনল্যাণ্ডের ব্যবসায়ী কেনফ দিকপাল ধর্মী মানুষ। যে এসে আশ্রয় চাইবে, তাকেই টেনে নেবেন কোলে। "দেখি, কোথায় কোন্ কাজে লাগাতে পারি তোমাকে। কাজ বুঝে মাইনে-কড়ির ব্যবস্থা করব তখন।"

ঠিক ঐ কথাই এডভার্টকে বললেন কেনফ।

ডোপেন খামারে আর তো থাকা চলল না! মালিক হাকন ফিরে আসছে যখন! এসে একটা অচেনা মানুষকে বাড়ীতে দেখলে কী ভাববে সে?

"আমি যে ছিলাম, তা তো আর গোপন থাকবে না! মার্জি বলবে। তা ছাড়া ক্ষেতে খামারে আমার অনেক কিছু হাতের ছাপ পড়ে আছে। পাহাড়ের মাথায় তুমিই বেড়া দিয়েছ, বা মাঠের মাটি থেকে বড় বড় পাথরের চাঙ্গড় তুমিই তুলে ফেলেছ। একথা সে কি বিশ্বাস করবে, মনে কর?"

"না, না, তুমি ছিলে কিছুদিন, সেকথা সে জানবে বইকি! বলব, মজুর রেখেছিলাম। পেটভাতায় মজুর। এমন তো মাঝে মাঝে যায় পাওয়া! বেপড়তা যার পড়ে, রুটি জোটাতে পারে না, স্রেফ দুটি দুটি খেতে পেলেই সে বর্তে যায় তখন।"

বিদায় নিয়ে আসতে বুকটা ভেঙ্গে গিয়েছিল এডভার্টের। ডোপেনকে সে ভাবতে শুরু করেছিল নিজেরই ঘরবাড়ী বলে।

বেরিয়ে এসেও বেশী দূরে সে পারল না যেতে। এক বেলার দুর্গম পথ হলেও ফোসেনল্যাণ্ডই ডোপেন খামারের নিকটতম ব্যবসাকেন্দ্র। সেইখানে গিয়েই মাথা গুঁজল এডভার্ট। কেনফ বললেন—"কাজ চাইছ? থাকো। দেখি কোন্ কাজে লাগাতে পারি। কাজ দেখে মাইনে-কড়ি ঠিক করব।"

এখানে অনেক কাজ। অনেক রকম কাজ। রুটি তৈরী

হয় এখানে, সারা অঞ্চলের রুটির চাহিদা মেটায় কেনফেরই রুটিখানা। লোহার মিস্ত্রি আছে, টিনের মিস্ত্রি আছে। তাদেরও ঢের কাজ। তাছাড়া সুবৃহৎ দোকান তো রয়েছেই। সেখানে না পাওয়া যায়, এমন চীজ দুনিয়ায় নেই। পোশাক-আশাক বাসনপত্র যন্ত্রপাতি, খাদ্যসামগ্রী মুদিখানার জিনিস, সব! সব পাওয়া যায় কেনফের স্টোরে। এডভার্টকে আপাততঃ দোকানেই নিয়ে নিলেন ম্যানেজার লোরেনসেন।

আগে কয়েকবার এ-দোকানে এসেছে এডভার্ট। তবে তখন এসেছে খরিদ্দার হিসেবে, ডোপেন খামারের তরফ থেকে। এসেছে, কেনাকাটা করেছে নগদ পয়সায়, চলে গিয়েছে। আলাপ-সালাপ করার সময় বা সুযোগ হয়নি তেমন। এখন তো সে এখানকারই বাসিন্দা। দোকানেই কাটে সারা দিন। সব সময়ে যে কাজ থাকে হাতে, তাও না। অবসর সময়ে ম্যানেজার লোরেনসেন আর বিক্রিওয়ালা ম্যাগনাস, দু'জনেই গল্পসল্প করতে খুব রাজী। আর তা ছাড়াও আছে টিন মিস্ত্রির বৌ। ওদের বাড়ীতেই ডেরা নিয়েছে তো এডভার্ট। অবসর পেলেই সে গল্প ফেঁদে বসে এডভার্টের সঙ্গে। এইরকম নানাসূত্র থেকে ডোপেন খামার সম্পর্কে অনেক ইতিহাস আস্তে আস্তে শুনতে পেলো সে।

হাকন ডোপেন। মারগ্রেটা লেভিসার স্বামী। লোকটা, হ্যাঁ, তার বৌ ঐ কথাই বলে বটে অচেনা লোককে। বলে যে হাকন আমেরিকায় গিয়েছে, বছর পাঁচেক পরে এসে মারগ্রেটাকেও নিয়ে যাবে। কিন্তু আসলে ঘটনাটা কী, জান? আমেরিকায় নয়, হাকন গিয়েছে জেলে। বার্জেন জেলে আছে সে। পাঁচ বছরের জেল, তার চার বছর পেরিয়েই গেল বুঝি। হয়েছিল কী, জান? খুন করেছিল হাকন। কেউ কোনদিন ভাবতে পারেনি যে হাকনের মত লোক ছুরি মেরে খুন করতে পারে একটা লোককে। শিষ্ট নিরীহ লোক হাকন। অকর্মার ধাড়ী, কিন্তু দাঙ্গাবাজ গুণ্ডা শ্রেণীর লোক নয়। সে যে খুন করে বসবে—

হাকনও এক মিনিটেই ধরাশায়ী। [পৃঃ ৬৭

অবশ্য, উত্তেজনার কারণ ছিল তার। খুব মর্মান্তিক অপমানের একটা কথাই বলেছিল সেই গেঁয়ো ভূতটা। হারুনের স্ত্রীর উপরে একটা মিথ্যে দুর্নাম চাপিয়ে। হারুন তা সহ্য করেনি। মেরে দিয়েছিল ছোরার এক ঘা। আর তাতেই খতম হয়ে গেল সেই দুর্মুখ।

বিচার হলো হারুনের। বিচারক বিশ্বাস করলেন যে লোক হারুন খারাপ নয়, হঠাৎ একটা চরম উত্তেজনার কারণ না ঘটলে খুন সে কখনো করত না। আগে সে কারও সঙ্গে কোনদিন অতি সামান্য ঝগড়াঝাঁটিও করেনি। লঘু-দণ্ডই তিনি দিলেন হারুনকে, মাত্র পাঁচ বৎসরের জেল। তাও আবার, চার বৎসর শিষ্ট শান্ত ভাবে কয়েদ খেটেছে ব'লে জেলখানার আইন অনুযায়ী এক বছরের দণ্ড সে মকুব পেয়েছে, ফিরে এসেছে চার বৎসরের মাথাতেই।

না, জেল যদিও খেটেছে, লোক তা বলে খারাপ নয় হারুন। তবে ঐ যে! লোক ভাল হলেও লোক সে অকর্মা। জুয়ায় ছাড়া এক পয়সাও কোনদিন রোজগার করেছে, এমন কথা সে বলতে পারবে না। তাও জুয়ায় জিতেছে যদি এক ডলার, হেরেছে দশ ডলার পিঠপিঠই। খাটত যদি, ওর যা জমিজায়গা জঙ্গল হয়ে পড়ে আছে, তাতে আবাদ করত যদি, আজ ওর বৌকে কম্বল বুনে সংসার চালাতে হয়?

বৌটার সুখ্যাতি কিন্তু সবাই করে। ভা-রী ভাল মেয়ে। ভা-রী ভাল। নিজেই তো দেখে এসেছে এডভার্ট। সে কী বলে?

তা এডভার্ট মন্দ কিছু বলে না—"ভালোই বলতে হবে বইকি! তবে দেমাক বেশ আছে। গরিব মানুষকে মানুষ ভাবে না।"

এ্যা? টিনমিস্ত্রির বৌ হেসেই কুটিকুটি—"ও মা, সে কী? সে নিজে কোন্ রাজরানী, শুনি?"

"রাজরানী না হলেও নিজের বাড়ীতে বসে থাকে পায়ের উপর পা তুলে। যে দিন-মজুরি করতে গিয়েছে তার খামারে, তার তুলনায় বড়লোক বইকি। দুই একদিন কড়া কথাও শুনিয়ে দিয়েছি আমি।"

এ-কথাগুলো অবশ্য সর্বৈব মিথ্যা। মতলব করেই রটাচ্ছে এডভার্ট। উদ্দেশ্যটা এই, হাকনের মনে এমনি একটা ধারণা জন্মাক যে তার স্ত্রীর সঙ্গে তার ভূতপূর্ব পেটভাতা দিনমজুরটার সম্পর্ক ছিল তিক্ত।

দিন যায়, একদিন হাতে-নাতে প্রমাণ পাওয়া গেল যে-এডভার্টের সে-মিথ্যে রটনাতে কাজ কিছুই হয়নি, হাকনের বিশ্বাস হয়নি যে ডোপেনে এডভার্টের সাময়িক উপস্থিতি বিশেষ একটা বিরক্তির কারণ ছিল তার স্ত্রীর কাছে। সরলা মাজিই তো সব কথা ফাঁস করে দিচ্ছে! কাকার প্রসঙ্গ উঠলেই সে গদগদ হয়ে পড়ে। 'পর্বতো বহ্নিমান ধূমাৎ'। মেয়ের কথা থেকেই মায়ের মনোভাব প্রকাশ পায়।

একদিন হাকন তার স্ত্রীকে নিয়েই কোসেনল্যাণ্ডে এসে হাজির, মালপত্র কিনবার জন্য। আগের দিনেও তারা একসাথেই আসত দু'জনে, একথা এডভার্ট শুনেছে। হাকনকে একা শহরে আসতে দেওয়া মনঃপূত ছিল না মারগ্রেটার। এলে পরে এত মদ খাবে সে, বেহুঁশ হয়ে পড়ে থাকবে পথে, শেষকালে মারগ্রেটাকে আসতেই হবে স্বামীটিকে বাড়ী নিয়ে যাওয়ার জন্য।

আগেও আসত একসাথে, এবারেও এসেছে। এডভার্ট মাল ওজন করতে ব্যস্ত, মারগ্রেটা তার দিকে তাকিয়েও দেখল না। হাকনও নিজের চাহিদার লিষ্টি এনে দিয়েছে ম্যাগনাসের হাতে। দূরে দাঁড়িয়ে আড়চোখের ক্রুদ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করছে এডভার্টের দিকে। সে তো শুনেছে যে ভূতপূর্ব দিনমজুর এখন ভোল পালটে দোকানী ব'নে গিয়েছে।

মালপত্র নিয়ে হাকনেরা দোকান থেকে বেরিয়ে গেল। এডভার্ট ভাবছে তারা বাড়ী চলে গিয়েছে বেলাবেলি। কোথায় কী! সন্ধ্যার পরে দোকান বন্ধ করে যেই বাইরে বেরিয়েছে এডভার্ট আর ম্যাগনাস, হঠাৎ হাকন এসে সামনে উদয় হলো। আর তুচ্ছ অছিলায় কলহ বাধিয়ে নিল এডভার্টের সঙ্গে—"জানো আমি খুনী লোক?"—

এই হুঙ্কার দিয়েই কলহ আরম্ভ তার। মারগ্রেটাকে কোথাও দেখতে পেলো না এডভার্ট।

খুনী? তা বটে! কিন্তু খুনীকে কায়দা করবার কৌশল এডভার্টের জানা আছে। ছেলেবেলায় শেখা সেই ল্যাং! যার সাহায্যে একদিন খুনী বাজনাওয়ালাকে ধরাশায়ী করেছিল ও, মাত্র তেরো বছর বয়সেই। হাকনও এক মিনিটেই ধরাশায়ী। দেখতে দেখতে ভিড় জমে গেল দুই প্রতিদ্বন্দ্বীকে ঘিরে। দেখা গেল, হাকন বেদম মদ খেয়েছে, লড়বার মত তাগৎ এখন নেই তার। এডভার্ট সরে গেল তাকে ছেড়ে দিয়ে।

মনটা খুব খারাপ, সমুদ্রের ধারে ঘুরে ঘুরে বেড়ালো অনেকক্ষণ। তারপর, রাত যখন এক প্রহরেরও বেশী হলো, রওনা হলো টিনমিস্ত্রির বাড়ীর দিকে, সেইখানেই ও থাকে তো!

পথেই পড়ে অতিথিশালা। একটা ছোট একতলা বাড়ী। কেনফ এটাকে তৈরী করে রেখেছেন তাঁর খরিদ্দারদের সাময়িক রাত্রিযাপনের জন্য। অনেক সময় দূর মফঃস্বল থেকে লোক আসে কেনাকাটা করতে, ফিরতে পারে না সেইদিনই। না-ই বা পারলে? থেকে যাও রাতটা, জায়গা আছে চমৎকার। ব্যবসা বোঝেন কেনফ। এই অতিথিশালায় আশ্রয়ের ভরসা আছে বলেই দূর-দূরান্তরের গ্রামবাসীরাও নির্ভয়ে আসে ফোসেনল্যাণ্ডে বাজার করতে।

অতিথিশালার দোরে দাঁড়িয়ে আছে মারগ্রেটা লেভিসা।

"হাকনকে তুমি ক্ষমা কর"—অনুনয় করল মারগ্রেটা।

* * *

এর কিছুদিন পরেই স্বয়ং মালিক কেনফ একদিন ডেকে পাঠালেন এডভার্টকে—"তুমি না আমায় বলেছিলে যে মেছো-জাহাজে কাজ করেছিলে এক সময়? পার? নিজে নিজে জাহাজ চালিয়ে লোফোটেন যেতে পার?"

"তা পারি"—সী-গালের চার্ট, ম্যাপ এসব অগস্ট ফিরিয়ে দেয়নি মালিকদের হাতে। আবার রিগায় যাওয়ার সময় সেগুলো নিয়েও

যায়নি বোঁচকা বেঁধে, এডভার্টের কাছেই আছে সে-সব। তাদেরই ভরসাতে ও আজ কেনফকে বলতে পারছে সাহস করে—"আমি পারি লোফোটেনে জাহাজ নিয়ে যেতে।"

"নিজের লোককে দিয়েই যদি কাজ উদ্ধার হয়, কেন বাইরে থেকে নতুন লোক আনব ? সে বিশ্বাসী লোক হবেই যে, তার নিশ্চয়তা কী ? কাঁচা পয়সা খরচ হবে কাপ্তেনের হাত দিয়ে—"

কেনফের বড় স্কুনার একখানা, ছোট স্লুপ একখানা। এ-সময়ে দু'খানাই লোফোটেন যাবে মাছ কিনবার জন্য। বিক্রি হবে ট্রন্‌জেমে। স্কুনারের কাপ্তেন একজন, পুরোনো লোকই আছেন কেনফের। কাপ্তেন নোরেম, নিকটেই বোডো গ্রামে থাকেন। এবারও তিনিই যাবেন স্কুনার নিয়ে, স্লুপের জন্য প্রতি বছরই নতুন নতুন কাপ্তেন খুঁজতে হয় কেনফকে। এবার তাই এডভার্ট সুযোগ পেয়ে গেল এরকম অপ্রত্যাশিতভাবে।

লোফোটেনযাত্রী নাবিক একজন আরও দরকার, এডভার্টের সহকারী হিসাবে। সে-লোক ফোসেনে পাওয়া যাবে না, একটা লোক খুঁজে আনবার জন্য এডভার্টকে বার্জেন যেতে হলো একদিন। লোক পাওয়া শক্ত হলো না। তবে সে-লোক স্লুপখানা লোফোটেন পৌঁছে দিয়েই কেটে পড়বে। ফেরার সময় নতুন লোক বহাল করতে হবে এডভার্টকে। "তাতে কোন অসুবিধে হবে না"—কেনফকে বলল এডভার্ট—"সে আমার নিজের দেশ-গাঁ। একজন কেন, একশো জন মাল্লা আমি হাঁক দিলেই পাব সেখানে।"

কাপ্তেন নোরেমের সঙ্গে আলাপ করে এলো এডভার্ট একদিন। তিনি হচ্ছেন পুরোনো কাপ্তেন, বড়-জাহাজের কাপ্তেন, কেনফের বহুদিনের বিশ্বাসী লোক। তাঁর সঙ্গে সদ্ভাব রেখে কাজ করতে হবে, কেনফই তা ওকে বলে দিয়েছেন। তা সদ্ভাব থাকবেই বা না কেন ? আলাপে সালাপে নোরেমকে তো বেশ ভালই লাগল এডভার্টের।

দুটো জাহাজ একদিনেই ছাড়ল। তবে পথে আর দেখা হলো

না ছুটোতে। নোরেমের জাহাজ অনেক দ্রুত চলে। এডভার্টের দুইদিন আগে তিনি লোফোটেন পৌঁছে গেলেন।

প্রথম সাক্ষাতেই তিনি এডভার্টকে বললেন—"আমি থাকছি না লোফোটেনে। এগিয়ে গিয়ে অন্য কোন মেছোবন্দরে মাছ কিনব। দুইজন এক জায়গায় না-থাকাই ভাল। কোথায় মাছ বেশী উঠবে, কোথায় কম উঠবে, আগে থেকে তো বোঝা যায় না! তুমি লোফোটেনেই থাক, এটা যখন তোমার নিজের জায়গা! তবে এক কথা বলে দিই—"

কথাটা খুব গোপনেই বললেন নোরেম। কথাটা এই যে যেদিন যে দামে মাছ কিনবে এডভার্ট। খাতায় খরিদ-দাম লিখবে তার চেয়ে শতকরা দুই ডলার বেশী। সব কাপ্তেনই তাই করে থাকে, আবহমান কালই করছে তা। এডভার্ট যদি না করে, দেশ-সুদ্ধ সব কাপ্তেন চটে যাবে তার উপরে। এমন দুর্নাম রটাবে তার যে কেনকের কানও ভারী হয়ে উঠবে, এডভার্টের চাকরি চলে যাবে দু'দিনেই।

চাকরি চলে যাবে? যায় তো যাক। এডভার্ট মনের কথা বলল না নোরেমকে, কিন্তু মনে মনে সংকল্প করল, মিথ্যাচরণ সে কখনো করবে না। হিসাবে এক সেণ্টও করবে না কারচুপি।

মাছের মরশুম শুরু হলো। পল্‌ডেন থেকে কেরোলাসের নৌকা এলো গাঁয়ের সব জেলেকে সঙ্গে নিয়ে। এবারে জোয়াকিমও এসেছে, এডভার্টের ছোট ভাই। কেরোলাসের নৌকাতেই চাকরি তার। এডভার্টকে দেখে তারা সব যেমন খুশী, তেমনি অবাক। সেই এডভার্ট একেবারে কাপ্তেন বনে গিয়েছে এরই মধ্যে? কী কাণ্ড! আঙুল ফুলে কলাগাছ একেবারে?

কাজ শুরু হয়ে গেল। কারও নিশ্বাস ফেলবার সময় নেই। চার চারটে মাস ঝড়ের মত বয়ে গেল মাথার উপর দিয়ে। এডভার্ট নিজের জাহাজ বোঝাই করে ফেলেছে মাছ কিনে। ন্যায্য দামই খাতায় লিখেছে। নোরেমের খবর অবশ্য মাঝে মাঝে পায় সে।

কিন্তু তাঁর সঙ্গে দেখা আর হয়নি। কাজেই কী দাম খাতায় তুলছে এডভার্ট, তা আর জানতে পারছেন না নোয়েম।

লোফোটেন থেকে পল্‌ডেন। লোফোটেনে বসেই মোড়ল কেরোলাসের সঙ্গে কথা ঠিক করে রেখেছে এডভার্ট। তার মাছ পল্‌ডেনের পাহাড়েই শুকোনো হবে।

পল্‌ডেনে এল এডভার্ট। এবারে সে কাপ্তেন এডভার্ট। এসেই দু'টো শোকাবহ ঘটনা চোখের সামনে ঘটতে দেখল সে। প্রথমতঃ তার মা মারা গেলেন। বহুদিন থেকেই তিনি নানা রোগে ভুগছেন। কিছুদিন থেকে একেবারেই শয্যাগত ছিলেন তিনি। প্রাণটা বুকের মধ্যে বাঁধা পড়ে ছিল, শুধু যেন এডভার্টকেই শেষ দেখা দেখবার জন্য।

দ্বিতীয় ঘটনাটা হলো সেই এ্যান-মেরায়া সম্পর্কিত। এখনো সে জলা থেকে কাপ্তেন স্ক্যারোর আর্তনাদ শুনতে পায়। রোজ সকালে একটা নির্দিষ্ট সময়ে। দিন দিন পুরোমাত্রায় পাগলই যেন হয়ে যাচ্ছে সে। ট্রন্‌জেমের ডাক্তারকে গ্রামে নিয়ে এসেছিল কেরোলাস। তিনি ব্যবস্থা দিয়ে গিয়েছিলেন—ওকে কোন পাগলা হাসপাতালে পাঠিয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হোক। তাই তাকে পাঠানো হলো এতদিনে। কেরোলাসই নিয়ে গেল তাকে, নিজেরই নৌকাতে এ্যান-মেরায়া খুশী। ঐ আর্তনাদ আর শুনতে হবে না, এই আশাতেই খুশী সে।

মাছ শুকোনো যথাকালে শেষ হলো। একটা জিনিস বড় পীড় দিয়েছে এডভার্টকে। গ্রামের লোকের কাছে ভাল ব্যবহার সে পায়নি এই শুকোনোর সময়টাতে। কোথায় আপনজন বলে বেশী বেশী তারা সহযোগিতা করবে এডভার্টের কাজে, তা নয়, কার্যক্ষেত্রে ঠিক উল্‌টো মনোবৃত্তির পরিচয় দিয়েছে তারা। খামোকা কামাই করেছে, কাজে হাজির হয়েও গল্প গুজবে সময় কাটিয়েছে, বেগ দেবার চেষ্টা করেছে নানাভাবে।

এডভার্ট বুঝতে পারেনি ব্যাপারটা। কেন এমন করে ওরা?

বুঝিয়ে দিলেন ওর বাবা। বৃদ্ধ, বহুদর্শী লোক তো! তিনি এক আঁচড়েই বুঝতে পারলেন ব্যাপারখানা। "ওদের হিংসা হয়েছে বাবা! তোমার হঠাৎ এতখানি উন্নতি ওরা ঠিক প্রসন্ন মনে নিতে পারছে না। সেদিনও তো তুমি ওদের সমান পর্যায়ের লোক ছিলে কি না! আজ হঠাৎ তুমি কাপ্তেন হয়ে এলে একেবারে, এ কি সহ্য হয় ওদের?"

যা হোক, কোনরকমে মাছ শুকিয়ে নিয়ে, গ্রামবাসীদের পাওনা-গণ্ডা মিটিয়ে দিয়ে, ফোসেনল্যাণ্ডের দিকে জাহাজের মুখ ঘুরিয়ে দিল এডভার্ট। সঙ্গে নিল একটি মাত্র সহকারী। পল্‌ডেনেরই একটি ছেলে, এক্সরা তার নাম, বয়স বছর পনেরো মাত্র।

৮

ফোসেনল্যাণ্ডে জাহাজ পৌঁছে দেবার সঙ্গে সঙ্গেই এডভার্টের দায়িত্ব শেষ। বার্জেনে ট্রন্‌জেমে মাছগুলো বেচে দেবার জন্য বন্দোবস্ত করে রেখেছেন কেনক। মাছের পরিমাণ এবং অবস্থা দেখে অখুশী হবার কোন কারণ পাবেন না মালিক, এইটেই প্রত্যাশা ছিল এডভার্টের। কিন্তু আশ্চর্য হয়ে সে লক্ষ্য করল যে মালিকের মুখে আগের মত আর হাসিখুশী ভাব নেই তেমন। একি তারই কোন গাফিলতির দরুন? অনেক ভেবেও সে ধরতে পারল না যে তার তরফ থেকে কী ত্রুটি হয়েছে।

কয়েকদিনের ভিতরই এডভার্টের হিসাবপত্র বুঝে নিলেন কেনক, তার মাইনেকড়িও মিটিয়ে দিলেন। এইখানেই খুব হতাশার কারণ ঘটল তার। সে একটা দায়িত্বপূর্ণ কাজের ভার নিয়ে গিয়েছিল, দায়িত্বটা বহনও করেছে খুবই সন্তোষজনক ভাবে। কোন ঝানু কাপ্তেনকে দিয়েও কেনক এর চেয়ে ভাল কাজ করিয়ে নিতে পারতেন না নিশ্চয়ই। অথচ মাইনে দেবার বেলায় তাকে কাপ্তেনের যোগ্য মাইনে মোটেই তিনি দিলেন না। সাধারণ মাল্লা ছাড়া অন্য কিছুই তাকে বলতে রাজী নন কেনক। অবিচার নয়? এক একবার তার এখন মনে হচ্ছে, কাপ্তেন নোরেমের পরামর্শটা অগ্রাহ্য না করলেই বোধ হয় ভাল হতো। বিচার যেখানে নেই, সেখানে গরিব কর্মচারী চুরি না করে করবে কী?

মনটা খিঁচড়ে গেল এডভার্টের। কেনক হয়ত ভেবেছিলেন, ছোকরাকে আবার তিনি দোকানে বসিয়ে দেবেন মাল ওজন করবার জন্য। কিন্তু এডভার্ট সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করল তাঁর প্রস্তাব। 'ব্যবসাপত্র কিছু করব ভাবছি—" বলল সে।

রাত্রে সে এখনো জাহাজেই থাকছে। মাছ সব খালাস হয়ে গিয়েছে, এখন চলছে জাহাজ ধোয়া মোছা রং-করার ব্যাপার।

এডভার্টই এখনো দেখাশোনা করছে সে-কাজের। "যে-কয়দিন আছি, দিলামই বা একটু খেটে"—এই তার মনোভাব।

রাত্রে সে একাই থাকে জাহাজে। এজরা পল্‌ডেন চলে গিয়েছে।

সে-রাত্রে ঘুম আসছে না এডভার্টের। চাকরি তো প্রত্যাখ্যান করল, ব্যবসা করবে বলে। কী ব্যবসা করা যায়? কোথায় গিয়ে করা যায়? অগস্ট থাকলে পরামর্শ দিতে পারত। কোথায় যে গেল হতভাগা অগস্ট! সেই যে সোলগ্রাড জাহাজে রিগা যাবে বলে রওনা হয়ে গেল—আর কোন খবর দেয়নি এ-যাবং।

কেবিনে শুয়ে নানা চিন্তা করছে এডভার্ট, কে যেন কড়া নাড়ল দরজায়। এ-সময়ে কে এলো জাহাজে? কোন চোর ডাকাত নয়ত? কেনফ সুবিচার করেননি, তবুও পয়সাকড়ি যথেষ্টই আছে এডভার্টের। ডোপেন থেকে চলে আসবার পর থেকে উপার্জন তো কম হয়নি তার! মাঝে পল্‌ডেনে গিয়ে বাবাকে আর ভাইবোনদের কিছু কিছু উপহার সামগ্রী কিনে দিয়েছিল বটে, তবু এখনও এক কাঁড়ি ডলার রয়েছে তার ব্যাগে। কোন ফাঁকে কথাটা যদি প্রকাশ হয়ে পড়ে থাকে, চোর আসা আটক কী? যদিও নরওয়ে দেশে চুরিডাকাতি হয় না বললেই চলে।

"কে?" বলে হাঁক দিল এডভার্ট।

আর সঙ্গে সঙ্গে কাঁপা কাঁপা মেয়েলি কণ্ঠে জবাব এলো—"আমি মারগ্রেটা"

মারগ্রেটা? এও কি সম্ভব? এডভার্ট আবারও হেঁকে উঠল —"কে?"—

আবারও সেই একই জবাব—"আমি মারগ্রেটা লেভিসা।"

আর দেরি করা চলল না। লাফিয়ে উঠে দরজা খুলল এডভার্ট। সত্যিই তো মারগ্রেটা! 'কী? কেন? কেমন আছ?"

এডভার্ট যে কী করবে তাকে নিয়ে, তাই যেন ঠিক পায় না।

মারগ্রেটা অতি করুণ কণ্ঠে তার বক্তব্যটা বলে গেল। তার

স্বামীর ঝোঁক হয়েছে—আমেরিকায় যাবে। এ-হতচ্ছাড়া দেশে সে থাকবে না। আমেরিকায় যাবে, যেখানে রোজগারের হাজার পথ খোলা আছে। যাবে স্ত্রী-কন্যাকে নিয়েই। মবলগ অর্থ দরকার জাহাজ ভাড়াতেই। ডোপেন খামার বিক্রি করে সেটা সংগ্রহ করার চেষ্টা করছে হাকন। কিন্তু একটাও খরিদ্দার জোটেনি। এদিকে হাকন প্রায় পাগল হয়ে উঠেছে আমেরিকার জন্য। এডভার্ট পারে কিছু উপায় করতে?

এডভার্ট একেবারে আকাশ থেকে পড়ল। মারগ্রেটা? মার্জি? ওরা যাবে আমেরিকায়? "না, না, কক্ষণো যেয়ো না।" এডভার্টের নিষেধটা যেন করুণ মিনতির মত শোনাচ্ছে।

কিন্তু মারগ্রেটার এক কথা—"হাকন পাগল হয়ে যাবে যেতে না পারলে। আর আমিও তাকে একা ছেড়ে দিতে পারি না। দিই যদি, ওকে আর ফিরে পাব না। কোথা দিয়ে কোথায় চলে যাবে, জীবনে আর দেখা পাব না ওর। তুমি পার যদি, দু'শো ডলার দাও আমাদের। ডোপেন বিক্রি করার চেষ্টাই আমরা করছি। তুমিই নাও। এ-পোড়া দেশে খদ্দের নেই। তা না হলে, অতখানি জায়গা! তুমিই তো একসময়ে বলতে, আবাদ করলে সোনা ফলানো যায় ওখানে—"

"ডোপেন দিয়ে আমি করব কী! আমার নিজের ঘরবাড়ী কি নেই? তবে তুমি চাইছ দু'শো ডলার, নিয়ে যাও। এই ব্যাগে দু'শোর বেশীই আছে। নিয়ে যাও, সুখে থাকো তুমি, ডোপেন আমার দরকার নেই। ও তোমাদেরই থাকুক। ফিরে আসতে হবেই। আমেরিকায় রোজগারের সুযোগ আছে, তা ঠিক। কিন্তু যে খাটবে না, তার আবার সুযোগ কোথা থেকে আসবে? হাকন খাটবার মানুষ নয়—"

ব্যাগটা এগিয়ে দিল এডভার্ট। সেটা নিয়ে, চোখের জল ফেলতে ফেলতে মারগ্রেটা নেমে গেল জাহাজ থেকে।

তার পরদিন সন্ধ্যাবেলায় জাহাজেই একটা ছোকরা এসে

একখানা কাগজ দিয়ে গেল এডভার্টকে। ডোপেন বিক্রি করে দিয়েছে হারুন, এডভার্টকে। তারই দলিল সেটা।

ডলারগুলো নেই। তার বদলে আছে এই দলিল। কী হবে এ দিয়ে? তবু কাগজখানা তুলে রাখল এডভার্ট।

*　　　　*　　　　*

ফিনমার্কের মেলা চলছে। জমজমাট মেলা। ফোসেনল্যাণ্ড থেকে বিদায় নিয়ে নিজের দেশে রওনা হলো এডভার্ট। হাঁটতে হাঁটতেই যাবে। অন্ততঃ বোডো পর্যন্ত যাবে এইভাবে। তাড়া কী? জীবনে যেন করবার কিছু নেই আর। গড়াতে গড়াতেই যাবে সে। কতদিনে বাড়ী পৌঁছোনো যায়, দেখা যাক।

পথে ফিনমার্কের মস্ত মেলা। সেই মেলায় দেখা মিলে গেল বুড়ো পাপটের। সেই ঘড়িওয়ালা ইহুদীর। এডভার্টকে দেখেই সে দাঁড়িয়ে পড়ল—"তোমায় দেখেছিলাম স্টকমার্কনেস মেলায়, না?"

"হাঁ, ঠিক মনে রেখেছ তো?"

"আমি একবার যাকে দেখি, তাকে ভুলি না। কী করছ এখানে? আমায় সাহায্য করবে একটু? এত মস্ত মেলা, একা মানুষ সামাল দিতে পারছি না। তুমি যদি কিছু ঘড়ি বেচে দাও—ধর, আমি যাচ্ছি মেলার উত্তর দিকে, তুমি যাচ্ছ দক্ষিণ দিকে—কাজ ঠিক ডবল হতে পারে।"

"আর আমি যদি ঘড়ির বোঝা নিয়ে ডুব মেরে দিই?"

"তু-মি? মানুষ-ঠকানোর লোক যে কে, তা মুখ দেখলেই চিনি আমি। তুমি লেগে যাও আমার কাজে। আমি বিনা পয়সায় খাটাব না।"

এডভার্টের হাতে কাজ কিছু নেই। জীবন উদ্দেশ্যহীন ঠেকছে। ঘড়ি তো ঘড়িই সই। হয় দুই পয়সা, হোক। দিনান্তে রুটির ব্যবস্থাটা হোক—

পাপটের নিজের কোটে একশো-একটা পকেট। ঠিক সেইরকম একশো-এক-পকেটওয়ালা কোট আর একটা সে পরিয়ে দিল

এডভার্টকে। প্রতি পকেটে একটা করে ঘড়ি। কোন্‌টার কত দাম, যত্ন করে শিখিয়ে দিল পাপট। "তোমার মুখ দেখলেই লোকে বিশ্বাস করবে। কিনবে ঘড়ি। বেরিয়ে পড় সাহস করে।"

মেলাটা মস্ত, থাকবেও দুই হপ্তা। এডভার্ট অনেক ঘড়ি বেচলো। পাপট নিজে দরদস্তুর করে, বোলচাল দেয়, ঠকায়ও মাঝে মাঝে। কিন্তু এডভার্টকে সে-সব করতে নিষেধ করে দিয়েছে। একদামে বিক্রি করে এডভার্ট। আর পাপটের সঙ্গে যে তার কোন সম্পর্ক আছে, প্রকাশ করে না তা।

হঠাৎই পাপট মারা গেল একদিন সেই মেলাতেই।

সকালে বেরুতে যাবে পকেটে পকেটে ঘড়ি-বোঝাই করে, হঠাৎ বসে পড়ল বুকে হাত চাপা দিয়ে। এডভার্টকে বলল—"বেরিয়ে দরকার নেই। শরীর ভাল বুঝছি নে। হয়ত ডাক এসে গিয়েছে। ঘড়িগুলো গোনো, নম্বরে নম্বরে মেলাও। আমার মহাজন হলো বার্জেনের কল্‌কারসেন জেইগারসেন কোম্পানী। সব ঘড়ি ফেরত দিয়ে দিও তাদের। দাম ফেরত দেবে তারা। সেইরকমই কথা আছে তাদের সঙ্গে। যা দেবে, তা তোমার। আমার ত্রিসংসারে আপনজন কেউ নেই। সামান্য যা-কিছু আছে, তোমায় দিয়ে গেলাম। মনোমত লোককেই দিলাম। আমাকে কবর দিও সমুদ্রের ধারেই কোথাও। জাতে ইহুদী বটে, তবে ধর্মে আমি খ্রীষ্টান। সেইভাবেই কবর দিও।"

এডভার্টকে হিসাব বুঝিয়ে দেবার একঘন্টা বাদেই ঘড়িওয়ালা পাপট মারা গেল। তাকে কবর দেবার ব্যবস্থা করতে পুরো দিনটাই লাগল এডভার্টের। রাতটা কাজেই ওখানেই হলো কাটাতে। পরদিন রওনা হলো বার্জেন।

কেল্‌কারসেন জেইগারসেন কোম্পানী খুব দুঃখ করল পাপটের মৃত্যুসংবাদ পেয়ে। ঘড়িগুলো ফেরত নিয়ে দাম বুঝে দিল এডভার্টকে। চার শো ডলারের উপরে পকেটে এল ওর।

এডভার্ট হাসল মনে মনে। দু'শো ডলার দিয়েছিল মারগ্রেটাকে

ভগবান চারশো ফিরিয়ে দিলেন। তার মানে তো এই, মারগ্রেটাকে সাহায্য করে সে ভগবানের পছন্দমত কাজই করেছে।

বার্জেন থেকে একটা স্টিমার ছাড়ছে। কোথায় যাবে স্টিমার, কোন জিজ্ঞাসাবাদ না করেই এডভার্ট উঠে বসল তাইতে। ভগবান যেখানে নিয়ে যাবেন, চোখ বুজে চলে যাবে ও। চিন্তা ভাবনা করা ও ছেড়ে দিয়েছে। চিন্তা ভাবনা করে হয় না কিছু।

স্টিমারের খোলে এক যুবতী, কেমন চেনা-চেনা মনে হয় যে! ওঃ, হ্যাঁ! একেও এডভার্ট দেখেছিল সেই স্টকমার্কনেস মেলায়। হোটেলের পরিবেশিকা ছিল এ। কী নাম? হ্যাঁ, মেটিয়া! "তুমি সেই মেটিয়া তো? অগস্টের সঙ্গে যার বিয়ের কথা—?"

"কোন কথাই হয়নি"—ঝাঁপিয়ে উঠল মেটিয়া—"কথাটা সেই তুলেছিল। আমি হাঁ, না কিছুই বলিনি। তা তুমি কেন এখানে?"

"আমি কাজে-কর্মে ঘুরছি। ফিনমার্কের মেলায় ঘড়ি বিক্রি করছিলাম কয়েকদিন। এবার সে-কারবার মিটিয়ে এলাম বার্জেন থেকে।"

মেটিয়ার দু'-চোখ চকচক করে উঠল—"কাজে-কর্মে ঘুরছ? ঘড়ির ব্যবসা ছেড়ে দিয়েছ, এখন অন্য কাজ ধরবে তো? কিছু মূলধন যোগাতে পার যদি, আমাদের সঙ্গে এসো না! অংশীদারিতে?"

"তোমাদের সঙ্গে, মানে?"

"মানে, আমার স্বামীর। নীলস্! নীলস্! স্টকমার্কনেস মেলাতে সেও তো ছিল হোটেলে! মনে পড়ছে না? তা হোক, সেই মেলার পরই নীলস্‌কে আমি বিয়ে করি। যা-তা লোকের ছেলে নয় ও। ওর বাবা একটা মেছো-জাহাজের কাপ্তেন। আমার আশা ছিল, নীলস্‌ও কাপ্তেন হবে একদিন। তা ওর মতিগতি সে-রকম না। ও বেছে নিয়েছে ফিরিওয়ালার কাজ। শ্বশুর কিপ্‌টে। মূলধন বলে পাঁচশোটা ডলার নীলস্ আদায় করতে পারেনি তার কাছে। কাজেই ব্যবসাতে জোর বাঁধছে না। তবে খুব লাভের

ব্যবসা, জানলে? ফিরিওয়ালারা শতকরা একশো লাভ করে গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে। আসবে আমাদের সঙ্গে?"

এডভার্ট নিজে আর ভাবনা-চিন্তা করবে না, ঠিকই করেছে একেবারে। দু-চোখ বুজে চলে যাবে, যেদিকে ভগবান নিয়ে যান। পাপটকে সে খুঁজে বার করেনি। অথচ পাপট তাকে চারশো ডলার দিয়ে গেল। এই মেয়েটাকেও সে বার করেনি খুঁজে। এর সঙ্গে গেলেও হয়ত ভালই হবে তার।

"তোমার সে-নীলস্ কোথায়?"—জিজ্ঞাসা করল সে।

"সে এই দিকেই ফিরি করছে গাঁয়ে গাঁয়ে। বোডোতে আমার সঙ্গে দেখা হবে কাল। তুমি যদি রাজী থাক, আমার সঙ্গে নেমে পড় বোডোতে। দেখাশোনা, কথাবার্তা হয়ে যাবে এখন।"

বোডোতে নেমেই পড়ল এডভার্ট।

প্রথম চোখোচোখিতেই ধারণা হলো এডভার্টের, এই নীলস্ লোকটা সৎ লোক নয়। তবে কথা এই, সৎ লোক এই দুনিয়ায় পাওয়া যাবে কোথায়? কাপ্তেন নোরেম সৎ লোক নন, ঘড়িওয়ালা পাপট সৎলোক নয়, অগস্ট তো সৎ নয়ই। অতবড় ব্যবসায়ী যে কেনফ মহাশয়, সৎ লোক নন তিনিও। সৎ যদি হতেন, তাহলে এডভার্টের দ্বারায় পুরো কাপ্তেনের কাজ করিয়ে নিয়ে তাকে তিনি সাধারণ মাল্লার মজুরি দিয়ে বিদায় করতে পারতেন না।

নাঃ, ব্যবসা যদি করতে হয়, অসৎ লোকদের বাদ দিয়ে তা করা চলবে না। তবে চেষ্টা করতে হবে, অসতের সঙ্গে মাখামাখি করেও নিজে যাতে সৎ থাকা যায়।

নীলস-এর প্রস্তাব সে গ্রহণ করল, তবে অংশীদার হবে না এডভার্ট। বোডোর মহাজনের কাছ থেকে একশো ডলারের মাল নগদ দামে কিনে নেবে সে, আদ্ধেক নিজের কাছে রাখবে, আদ্ধেক তুলে দেবে নীলস্-এর থলেতে। তারপর দুইজন চলে যাবে দুই দিকে। নীলস্ উত্তর অঞ্চলটা ভাল চেনে, যাক সেইখানে। এডভার্ট যাবে দক্ষিণে। মাল বিক্রি করে নীলস্ যেন মালের দাম ঐ পঞ্চাশ

ডলার ফেরত পাঠিয়ে দেয় এডভার্টকে। ফোসেনল্যাণ্ডে কেনফের আড়তে পাঠালেই পেয়ে যাবে এডভার্ট। পঞ্চাশ ডলারের সঙ্গে ব্যবসার লভ্যাংশ নীলস্ ইচ্ছে করলে যথারুচি কিছু দিতে পারে। কিছু লভ্যাংশ এডভার্টের পাওয়া উচিত, পাওয়ার প্রত্যাশা সে নিশ্চয়ই করে। নীলস্ যখন দেখল যে অংশীদার হতে কোনমতেই এডভার্ট রাজী নয়, তখন অগত্যা রাজী হয়ে গেল এই বন্দোবস্তেই।

বিদায়কালে এডভার্ট সতর্ক করে দিল নীলসকে—"আমার অর্থটা মেরে দেবার চেষ্টা করো না, পারবে না মেরে দিতে। কারণ মেটিয়ার কাছ থেকে তোমার বাবার নাম আমি জেনে নিয়েছি। তিনি মেছো-জাহাজের কাপ্তেন, কী-বছর লোফোটেনে জাহাজ নিয়ে যান মাছ কিনতে। আর লোফোটেন তো আমার বাড়ীর কাছে। আমি সেখানে গিয়ে তাঁকে ধরব। আমার পাওনা-গণ্ডা তাঁর কাছ থেকেই আদায় করব। মাঝখান থেকে বাপের বিষনজরে পড়ে যাবে তুমি।"

মেটিয়া ঝঙ্কার দিয়ে উঠল—"দেশী লোক। আগের পরিচয়ও আছে। অত অবিশ্বাস কর কেন?"

"পরিচয় আগে থেকেই আছে, সেকথা ঠিক। কিন্তু যেটুকু আছে, সেটুকু থেকে তোমার সম্পর্কে ভাল ধারণা কিছু জন্মায়নি আমার। আমার বন্ধু অগস্টের সঙ্গে যা-ব্যবহার তুমি করেছিলে, সেটা ঠকামি ছাড়া কিছু নয়।"

তারপর ছাড়াছাড়ি। নীলস্ গেল উত্তর অঞ্চলে। যতদূর যাওয়া যায় বরফ ঠেলে, ততদূরই যাবে। যত সুদূরে যাবে, ব্যবসাতে মুনাফা হবে ততই বেশী। শতকরা একশো, বলেছে মেটিয়া। "তারও বেশী, তারও বেশী"—বলছে নীলস্। এডভার্ট জানতে চেয়েছিল, এতই যখন লাভের ব্যবসা। তখন পুরোনো কারবারী হয়েও মাল কিনবার পয়সার অভাব তোমার হয় কেন?"

নীলস্ একথার উত্তর দেয়নি, দিয়েছিল মেটিয়া—"কারবারের পয়সা বদ্‌খেয়ালে উড়িয়ে দিলে অভাব হবে না তো কী হবে? সৎপথে থাকলে এতদিন হতভাগার নিজের একখানা দোকান হত।"

এইবার ওদের সঙ্গ ত্যাগ করে দক্ষিণমুখী পথ ধরল এডভার্ট। লক্ষ্য ফোসেনল্যাণ্ড পর্যন্ত। সে-পর্যন্ত যেতে যেতে যদি বস্তার মাল ফুরিয়ে যায়, তখন কেনফের দোকান থেকে আর এক বস্তা মাল সে নেবে, তারপর হাঁটবে উত্তরমুখো, বোডো পর্যন্ত, উপকূলের রাস্তা দিয়ে। বোডো থেকে ফোসেনল্যাণ্ড, এই হবে তার পরিক্রমার পথ। দক্ষিণমুখী যাবার বেলায় ধরবে পূর্বাঞ্চলের কোন রাস্তা, উত্তরমুখী ফেরার বেলায় হাঁটবে সমুদ্রের ধার দিয়ে।

এটা সত্যিই বলেছে কিন্তু নীলস্ আর মেটিয়া। অসম্ভব লাভের কাজ। আড়ত-বাজার খুব কম। ফিরিওয়ালার স্বর্গ এসব জায়গা।

মনের আনন্দে পথ চলছে এডভার্ট। অকস্মাৎ ফ্রোজা গ্রামের এক খামারে সে দেখল—কাকে? দেখল তারই বন্ধু অগস্টকে।

"এডভার্ট'ও বলে তুমি এখানে? আগষ্টও বলে "তুমি এখানে?"। পৃঃ ৮১

৯

দুইজনেই দুইজনকে দেখে হতবাক। এডভার্টও বলে—"তুমি এখানে?" অগস্টও বলে ঠিক সেই কথা—"তুমি এখানে।"

এডভার্টের কাহিনী দুই কথাতেই শেষ হলো। কিন্তু অগস্টের কথা আর ফুরোতে চায় না। সোল্‌গ্লাড জাহাজে চড়ে সে বল্‌টিক সমুদ্রে গিয়েছিল। তারপর, সে এক কেলেঙ্কারি, সেই বল্‌টিকের হাঁস-চরা ডোবাতে কিনা জাহাজডুবি হলো অগস্টদের! ছিঃ ছিঃ ছিঃ ছিঃ, এখনও সেকথা মনে হলে লজ্জায় মাথা কাটা যায় ওর। হতো আটলান্টিকে, একটা বলবার মত কথা ছিল সেটা। আগেও তিন তিনবার তা হয়েছে অগস্টের। আটলান্টিকের মাঝ-দরিয়ায় জাহাজ-ডুবি। সে সব গর্ব করে গল্প করার জিনিস। লোমহর্ষণ ব্যাপার! নরঘাতক অসভ্য জাতির হাতে পড়ে প্রাণসংশয়! নিতান্ত দৈবাৎই একখানা মার্কিন বোমারু উড়ে যাচ্ছিল আকাশপথে, তারাই উদ্ধার করে অগস্টের দলের আটাত্তরটা নাবিককে। সে-সব গল্প করার মত জিনিস—।

এডভার্ট বাধা দিয়ে বলল—"পল্‌ডেনে চার বচ্ছর কাটালে, সেসব গল্প তো করনি!"

"জিজ্ঞাসা করেনি তো কেউ!"—এই বলেই কথা পালটে ফেলল অগস্ট—"বল্‌টিকে জাহাজডুবির ফলে আর কোন ক্ষতি হয়নি, কেবল পয়সাকড়ি জামাজুতোগুলো তলিয়ে গেল সেই হাঁস-চরা ডোবায়। কূলে যখন উঠলাম এক জেলে ডিঙ্গিতে চড়ে, তখন পরনের পোশাকটি আর এ্যাকর্ডিয়নটি ছাড়া ত্রিসংসারে নিঃসম্বল আমি একেবারে। তারপর হাঁটতে শুরু করলাম। এ্যাকর্ডিয়ন বাজাই, আর এক একদিন এক এক খামারে অতিথি হই। শেষকালে এখানে এসে আটকে গেলাম। এখানকার একটি মেয়ে, জানলে? সেই স্টকমার্কনেসের মেটিয়ার চাইতে ঢের ভাল মেয়ে, তাকে বিয়ে

করব ঠিক করেছি। সে কাজ করে এই খামারে। কাজেই আমিও কাজ নিয়েছি এখানে। একটা ঘর-টর বাঁধব। পয়সা জমছে তো আস্তে আস্তে।"

এডভার্ট রেগে আগুন—"ওসব মতলব ছাড় তো! তোমায় এক্ষুণি চলে যেতে হবে আমার সঙ্গে।"

দেখা গেল, অগস্টের তাতে বিশেষ আপত্তি নেই। বিয়ে করা বা এখানে ঘর বাঁধার জন্য খুব বেশী আগ্রহ যে তার আছে, তা মনে হলো না এডভার্টের। খামারের মালিকই যা কিছু বখেড়া বাধিয়েছিল। প্রথমে তো সে ছাড়তেই চায় না অগস্টকে—"এরকম হঠাৎ কেউ চলে যেতে পারে নাকি কাজ ছেড়ে? আমার কাজ চলবে কেমন করে?"

মালিককে থামিয়ে দিল তার স্ত্রী—"শীতকাল সামনে। কী-কাজ এখন আছে শুনি? বসিয়ে বসিয়ে খাওয়াতে হতো, মাইনে গুণতে হতো। তার চেয়ে যেতে চাইছে, যাক।"

তারপর শুরু হলো মাইনের হিসাব। ফাঁকি দেবার জন্য অনেক চেষ্টা করেছিল মালিক। এডভার্ট পড়াশোনায় কাঁচা হলেও হিসাবটা বোঝে। মালিকের কারচুপি সে ধরে ফেলল, রুখে উঠল তার উপরে। মালিকটাও ষণ্ডা গুণ্ডা লোক। একটা মারামারিই হয়ে যেত হয়ত। তাও থামিয়ে দিল বাড়ীর গিন্নী। মোট তিন ডলার পাওনা হলো অগস্টের। তার মধ্যে দুই ডলার সে তক্ষুণি দিয়ে দিল তার বাগ্‌দত্তাকে। বিয়েটা যে হলো না, তারই ক্ষতিপূরণ স্বরূপ।

অগস্টকে নিয়ে এবার সোজা কোসেনল্যাণ্ডে চলে এলো এডভার্ট। কেনকের দোকান থেকে মাল কিনল দেদার। দুটো বস্তা এবার। একটা নিজে নেবে, একটা তুলে দেবে অগস্টের কাঁধে। দুইজন আলাদা আলাদা পথে যাবে, যদিও গন্তব্যস্থান দুইজনেরই এক, পলডেন। ডোপেনেও একটা বাড়ী আছে এডভার্টের। এখান থেকে মাত্র তিন চার ঘণ্টার পথ পাহাড়ে পাহাড়ে। কিন্তু

সেখানে যাওয়ার কথা একবারও তার মনে হলো না। কী হবে সেখানে গিয়ে? যাক, ভেঙ্গে যাক। জঙ্গল হয়ে যাক। মায়গ্রেটাই যখন চলে গিয়েছে, ভোপেনও যাক।

পল্‌ডেন যাবে। ওখানে একখানা দোকান করার ইচ্ছে এডভার্টের। নিজে চিরদিন বসে থাকবে না দোকান নিয়ে। সেটা দিয়ে দেবে ভাই জোয়াকিমকে। নিজে? তার এই ভবঘুরে-জীবনই ভাল লাগছে বেশ।

কেনফের ছেলে রোমিও, বয়স মোটে পনেরো, এরই মধ্যে ব্যবসার ব্যাপারে সে বাপের ডান হাতের মত হয়ে উঠেছে। সে আবার এডভার্টের খুবই ভক্ত। সেই যখন প্রথম এসেছিল এডভার্ট দোকানের মাল ওজন করতে, তখন থেকেই। এডভার্ট এখন নিজে দোকান করতে চাইছে শুনে সে প্রস্তাব দিল, যত খুশী মাল নিয়ে যাক ও, যতদিনে পারে দাম শোধ করবে। এডভার্ট বলল,—"ধন্যবাদ, তুমি না-হয় দিলে মাল, এতদূর আমি তা নিয়ে যাব কেমন করে? দুটো বস্তায় আর কত ধরে?"

"বস্তায় করে মাল নিয়ে কি আর দোকান করা যায়? নৌকো! নৌকো কেনো একখানা। চার দাঁড়ের একখানা নৌকো। আমাদেরই আছে। আমি বেচে দেব, তুমি যদি নাও।"

নৌকোখানায় সামান্য মেরামত দরকার। নতুন রং লাগালেও ভাল হয়। এইসব হচ্ছে এদিকে, এডভার্ট একদিন শুনল ঘোরতর দুঃসংবাদ একটা। সংবাদ ওর নিজের সম্পর্কে কিছু নয়। কাপ্তেন নোরেমের নাকি ক্যান্সার হয়েছে। তাঁর গোটা জিভটাই ডাক্তারেরা কেটে বাদ দিয়েছে। বাড়ীতে তিনি নেই। ট্রন্‌জেমে আছেন হাসপাতালে। জীবনের আশা নেই। এবং জীবন যত তাড়াতাড়ি যায় এখন, ততই ভাল।

এডভার্ট স্তম্ভিত। এই নোরেম, এই তো মাত্র সেদিন ইনি লোফোটেনে বসে এডভার্টকে উপদেশ দিচ্ছিলেন—"সত্যিকার দামের

চাইতে কিছু বাড়িয়ে দাম লিখবে খাতায়। সবাই যা করছে, তুমিও তা কেন করবে না ?"

তবু, বাড়ীতে যদি থাকতেন নোরেম, এডভার্ট অবশ্যই গিয়ে দেখে আসত তাঁকে। কিন্তু হাসপাতালে তিনি। এডভার্ট অবশ্য ট্রন্‌জেমের নীচে দিয়ে যাবে সমুদ্রপথে নৌকা বেয়ে. কিন্তু মালপত্র ফেলে সে ডাঙ্গায় উঠবে কেমন করে ? অগস্ট তো নৌকায় যাবে না ! সে যাবে সমুদ্র থেকে বহু দূরের স্থলপথ দিয়ে ফিরি করতে করতে '

অগস্ট ইতিমধ্যে ভারী সুনজরে পড়ে গিয়েছে কেনফের। একদিন তিনি সমুদ্রের ধারে দাঁড়িয়ে আছেন, দূরবর্তী ফ্যালোর ইস্টিমার স্টেশনের দিকে তাকিয়ে। একখানা ইস্টিমার সবে ভিড়তে যাচ্ছে ওখানে ! নির্নিমেষে কেনফ তাকিয়ে আছেন সেদিকে, আর ক্রোধে নৈরাশ্যে তাঁর অন্তরটা জ্বলে যাচ্ছে। এত সুবিধা থাকতেও হতচ্ছাড়া ইস্টিমার কোম্পানী ফোসেনে স্টেশন করবে না, সেই যে ফ্যালোর জলে-ডোবা অন্তরীপটাতে ভিড়ছে ভাইকিংদের আমল থেকে, সেখান থেকে নড়ে বসবে না কোনমতেই। রাগে দাঁত কিড়মিড় করছেন কেনফ।

হঠাৎ অগস্ট কথা কয়ে উঠল তাঁর পিছন থেকে। সে কেমন করে জানল, কোন্ কথা কেনফের মনে তোলপাড় করছে এই মুহূর্তে ?

সে বলে উঠল—"এইখানে একটা ডক করেন যদি, তারই লোভে ওরা স্টেশন এখানে তুলে আনতে পারে। ফ্যালোতে তো জলের মধ্যে নামিয়ে দিচ্ছে মালপত্র মানুষজন সব কিছুকে।"

কেনফ চমকে উঠলেন, পিছন ফিরে তাকালেন অগস্টের দিকে, পরিচয় জানতে চাইলেন। তারপরে বললেন—"এখানে চাকরি যদি করতে চাও, লেগে যেতে পার। তোমার পরামর্শ, ওটা আমি ভেবে দেখব। ঐ ডক।"

"দেখুন ভেবে। বিস্তর খরচ। কিন্তু পরে ভাল আয় দেবে। ফোসেনের গুরুত্ব চারগুণ বেড়ে যাবে। চাকরির কথা যা বললেন—ধন্যবাদ, যদি করি, আপনার কাছে আসব। তবে আমি জাত ভবঘুরে।

ঘুরে বেড়াতেই ভালবাসি। উপস্থিত পল্‌ডেনে যাচ্ছি এডভার্টের সঙ্গে। জানেন তো এডভার্টকে।"

তিনদিনের দিন অগস্ট ডাঙ্গাপথে রওনা হয়ে গেল উত্তরমুখে। আর তার দুই ঘণ্টা বাদেই জলপথে রওনা হলো এডভার্টও। কয়েকটা নির্দিষ্ট জায়গায় নৌকা বেঁধে অপেক্ষা করে থাকবে এডভার্ট। অগস্ট সেইখানে এসে নতুন মাল তুলে নেবে নৌকা থেকে।

এডভার্টও ফিরি করবে নিশ্চয়ই। তবে কূল থেকে বেশী দূরে যাবে না। যেখানেই দেখবে জলের ধারে লোকালয়, সেইখানেই উঠে যতটা পারে মাল বেচে দেবে।

পুরো একমাস বাদে এডভার্ট তার নৌকা বাঁধল বাহির পল্‌ডেনে। অগস্ট এইখানে এসে মিলিত হবে তার সঙ্গে। তারপর একত্রে বাড়ী যাবে দুজনে।

গোটা দেশের লোকের তাক লেগে গেল সেদিন।

বাহির-পল্‌ডেন থেকে দুটি যুবক আসছে, স্বাস্থ্যোজ্জ্বল বলিষ্ঠ চেহারা, তেমনি আবার গায়ে ঝলমল করছে দামী নতুন পোশাক। বুকের উপরে সোনার চেন, হাতের আঙ্গুলে জোড়া-জোড়া আংটি। দু'জনেরই কাঁধে নানা-রংয়ে-বিচিত্র সুন্দর ঝোলা, নানা রকম শৌখিন সামগ্রীতে আকণ্ঠ বোঝাই।

কে এলো ? কে এলো ?

এলো এডভার্ট। এলো অগস্ট। দিগ্বিজয়ী দুই ভবঘুরে সন্তান পল্‌ডেনের। এডভার্ট-এর বুড়ো বাবা রাস্তায় এসে দাঁড়ালেন খবর পেয়ে। প্রতি বাড়ীর দরজাতেই ছোটখাটো এক একটা ভিড় জমে গেল ঘর-ছাড়া ছেলেদের ঘরে ডেকে নেবার জন্য।

অগস্টের মাসী কবেই মারা গিয়েছেন। সে এবার এডভার্টের বাড়ীতেই উঠবে, কথা ঠিক হয়ে আছে।

কয়েকদিন ধরে উৎসবই যেন চলল একটা এডভার্টের বাড়ীতে। বাবা, ভাই, দুই বোন প্রত্যেকের জন্যই ভাল ভাল উপহার সামগ্রী কিনে এনেছে এডভার্ট। নানা রংয়ের পশমী কাপড় এনেছে। ক্লাভা

গ্রামের জোসেফিনাকে ডেকে আনা হলো, দুই বোন হোসিয়ার আর পলিনার গায়ের মাপে হাল-ফ্যাশানের পোশাক বানিয়ে দেবার জন্য। দর্জিগিরিতে ওস্তাদ ঐ জোসেফিনা। ছেলেবেলায় ট্রন্‌জেমে ছিল ও। সেখানেই শিখেছিল বিদ্যেটা।

সেই যে এজরা, সে-ছোকরা এতদিনে বড়-সড় হয়েছে। ঘর বাঁধবার জন্য তৈরী সে। হোসিয়াকেই সে বিয়ে করবে, সব ঠিক। জমি সে কিনেছে অনেকখানি। কেরোলাসেরই ছিল জমিটা। সেই অলক্ষুণে জলার এধারে। গ্রাম থেকে জলায় যেতে হলে এবার এজরার জমির উপর দিয়েই যেতে হবে লোককে।

কেরোলাস এক চালাকি খেলেছে। জমিটার সঙ্গে জলাটাও চাপিয়ে দিয়েছে এজরার মাথায়। জলাও যে কেরোলাসেরই সম্পত্তি, একথা গাঁয়ের লোকের মনেই ছিল না এতদিন। এইবার মনে করিয়ে দিল কেরোলাসই। আর জেদ করে বসে রইল—জমি যদি কিনতে হয় এজরাকে, জলাও কিনতে হবে। অবশ্য নামমাত্র দামেই বিক্রি হবে জলাটা। তাহলেও কিছু-না-কিছু দাম হবেই দিতে।

"কী করব আমি ভূতুড়ে জলা কিনে?"—অনেক কাকুতি করেছিল এজরা। "ভূত ধরবি জাল ফেলে ফেলে, আর লোফোটেনে নিয়ে বেচে দিবি"—কেরোলাস করেছিল নিষ্ঠুর ঠাট্টা।

শেষ পর্যন্ত কেরোলাসের দাবি শিরোধার্য করে জলা-সমেতই জমিটা কিনেছে এজরা। ঘরের ভিতও খুঁড়েছে। জলা থেকে যতদূরে সম্ভব। "থাকুক পড়ে জলা। শক্ত করে বেড়া দিয়ে রাখতে হবে"—মনে মনে বলেছে এজরা।

ভূত? না, ভূতের আর কোন সাড়া পাওয়া যায় না জলা থেকে। স্কারোর অশরীরী আত্মা যে সেখানে রোজ সকালে এক একবার আর্তনাদ করে উঠত কয়েক বছর আগে, সেটা শুধু এ্যান-মেরায়াকে ভয় দেখাবারই জন্য। আজ কয়েক বছর এ্যান্‌-মেরায়া রয়েছে বহুদূরের এক পাগলা-গারদে, জলাও রয়েছে নিস্তব্ধ।

মাঝে মাঝে কেরোলাস খবর নেয় বৌয়ের। সে ভাল হয়ে

উঠেছে। উন্মাদাগারের ডাক্তারেরা বলেছেন, কেরোলাস তার স্ত্রীকে বাড়ী নিয়ে আসতে পারে এবার। ভয় পাচ্ছে কেরোলাসই। তাকে গ্রামে ফিরতে দেখলে স্ক্যারোর ভূত যদি আবার কাঁদতে শুরু করে দেয় রুটিন-মাফিক ?

এই যখন পরিস্থিতি, এডভার্ট আর অগস্ট ফিরল গাঁয়ে। হবু-বোনাই এজরা এখন ওদের পরম আত্মীয়, সময় পেলেই এসে ভিত খোঁড়ার কাজে সাহায্য করে তাকে। একদিন এজরা জলার দিকে আঙুল তুলে আক্ষেপ করছে—"দেখ তো দাদারা, কেরোলাস মোড়ল খামোকা কী উৎপাত আমার গলায় গেঁথে দিল ! ও-জলা দিয়ে কোন্ উপকার হবে আমার, বল তো !"

অগস্ট দুম করে বলে বসল—"হতভাগা মুখ্খু, তুই বড় মানুষ হয়ে যাবি ঐ জলা থেকে।"

এজরা তো হাঁ করে ফেললোই একথা শুনে, হাঁ করে ফেললো এডভার্টও। কী রকম ? জলা থেকে বড়লোক ?

অগস্ট বলল—"জলায় আছে কাদা। কাদা মানে সার। ঐ জলায় যেদিন আবাদ করবি, সোনা ফলবে ওতে। জায়গাও তো অনেক ! অনেক জায়গা ! এ-গাঁয়ের সব-চেয়ে বড়লোক তুইই হবি রে এজরা !"

সেইদিনই কেরোলাসের সঙ্গে সাক্ষাৎ অগস্টের। যেন দৈবাৎই সাক্ষাৎ। "মোড়ল খুড়ো ! খুড়ীকে বাড়ী আনছ কবে ? শুনছি সেরে গিয়েছে।"

'তা তো গিয়েছে বাবা ! কিন্তু ভয় পাচ্ছি। তাকে দেখলে স্ক্যারোর ভূত যদি আবার কান্নাকাটি শুরু করে দেয় ? জানো তো ? সেবার আর কেউ শুনতে পেতো না ভূতের কান্না, শুনতে পেতো শুধু তোমারই খুড়ী !"

অত্যন্ত সপ্রতিভের মত অগস্ট জবাব দিল—"খুড়ীই বল, অন্য কেউই বল, কাউকে যাতে আর ভূতের কান্না না শুনতে হয়, তার ব্যবস্থা তো তোমার হাতেই আছে মোড়ল খুড়ো। স্ক্যারোর মড়াটাকে

জলা থেকে তুলে গির্জার কবরখানায় যথাশাস্ত্র কবর দাও। পবিত্র মাটিতে আশ্রয় পায় না যখন প্রেতাত্মারা, তখনই তারা কেঁদে কেঁদে বেড়ায় ওরকম। একথাও কি আর জানো না তোমরা? না যদি জানা থাকে, পাদরি সাহেবকে জিজ্ঞেস কর।"

কেরোলাসের টনক নড়ল। তাই তো! অগস্ট ছোকরা কথা তো ভুল বলেনি! এটা জানা কথাই তো! পবিত্র মাটিতে কবর না পেলে মানুষ ভূত হয় আর ঐ রকম কেঁদে কেঁদে বেড়ায়।

কেরোলাস পাদরিকে জিজ্ঞাসা করল, গাঁয়ের বুড়োদেরও জিজ্ঞাসা করল। অগস্ট যা বলেছিল, সবাই একবাক্যে সায় দিল তাতেই। স্ক্যারোর দেহটা তুলে গির্জার কবরখানায় যদি সমাধি দেওয়া যায়, তাহলে কেঁদে কেঁদে বেড়ানোর হাত থেকে রেহাই পায় তার আত্মাটা।

কেরোলাসের দরকার অবশ্য তার স্ত্রী এ্যান-মেরায়াকে রেহাই দেওয়া, স্ক্যারোর আত্মাকে নয়। তবু একসাথে দুটোই হয়ে যায় যদি, যাক না!

কিন্তু অতল দহে ডুবে রয়েছে স্ক্যারোর দেহ। কী করে তা তোলা যাবে? "বলা সহজ, করা অসম্ভব"—বলল গ্রামবাসীরা।

"অসম্ভব মোটেই নয়"—বলল অগস্ট। এখন তো তোমাদের কুড়েমির সময়! সাতটা দিন গাঁয়ের সমর্থ লোকেরা আমার সঙ্গে এসে খাটো যদি, জলায় কাদা, জল কিছুই থাকবে না। স্ক্যারোকে দেখতে পাবে বহাল-তবিয়তে ঘুমিয়ে আছে কাদার বিছানায়।"

পলডেনের এবড়ো-খেবড়ো পাহাড়ের মাথায় মাছ-শুকোনোর মাঠ তৈরী করেছিল এই অগস্টই, যার কল্যাণে গ্রামের লোক সেই থেকে দেদার পয়সা রোজগার করে যাচ্ছে ফী-সাল, সেকথা কি ভুলবার? অন্যের কাছে যা অসাধ্য মনে হয়, অগস্টের কাছে তা সহজ। হয়ত সত্যিই এ কাজটাও হাসিল করে তুলবে ও। যায় যদি গ্রামের চিরন্তন অভিশাপটা এইভাবে ঘুচে, যাক না। গ্রামবাসীরা রাজী আছে খাটতে।

কী করে কী করা হবে, অগস্ট বাৎলাক এইবার।

"যে যার কোদালগুলো নিয়ে চলে এসো জলায়"—বলল অগস্ট। গ্রামের জলনিকাশ হয় খাঁড়ির যে-অংশটা দিয়ে, তারই মুখ থেকে শুরু করে জলা পর্যন্ত দড়ি খাটিয়ে নিল অগস্ট সর্বপ্রথমে। তা প্রায় সিকি মাইল লম্বা হলো লাইনটা।

তারপর সেই দড়ি-বরাবর কোদাল বসাতে লেগে গেল গাঁয়ের যত লোক। ছয় ফুট গভীর, তিন ফুট চওড়া নর্দমা হবে একটা। নরম মাটি, ঠিক সাত দিনের মাথায় নর্দমা খোঁড়া শেষ হয়ে গেল। হুড়হুড় করে জলার কাদা নামতে লাগল খাঁড়ির জলে। কালো হয়ে গেল খাঁড়ির জল। তা যাক। একটা ভাটিতেই ও-কাদা নেমে যাবে গভীর সমুদ্রে।

অতল দহ? আদৌ না। দহটা আট-নয় ফুট আন্দাজ গভীর। নীচে শক্ত পাথর। সেই পাথরের উপর শুয়ে আছেন কাপ্তেন স্ক্যারো জামা জুতো সব পরেই। তাঁর পাশেই প'ড়ে আছে একটা গোরুও। গোরুটা মার্টিনাসের। হারিয়ে গিয়েছিল দুই বছর আগে।

ধুয়ে মুছে স্ক্যারোর মৃতদেহ গির্জায় নিয়ে রাখা হলো এক রাত। পাদরি সাহেব অনেক প্রার্থনা করলেন তার আত্মার মুক্তির জন্য। তার পরদিন কবরখানার ভিতরে সমাধি খুঁড়ে, স্ক্যারোকে নামিয়ে দেওয়া হলো তার মধ্যে। কফিনের খরচটা গ্রামবাসীরা চাঁদা করেই তুলেছিল।

কেরোলাস এইবার নির্ভয়ে এ্যান-মেরায়াকে বাড়ী আনতে পারে। তার শুধু আফশোষ, জলাটা সে এঞ্জরাকে বেচে দেওয়ার আগে কেন এ-মতলবটা দেয়নি অগস্ট। ওঃ, অনেকখানি জমি হাতছাড়া হয়ে গিয়েছে।

নিজের বাড়ীতেই একখানা দোকান-ঘর তুলেছে এডভার্ট। নিজে অবশ্য কমই বসতে পারে দোকানে, ভাই জোয়াকিমের বা বোন পলিনের উপরেই সে-ভার সাধারণতঃ থাকে। বোন হোসিয়া তো এজরাকে বিয়ে করে নিজের বাড়ীতেই চলে গিয়েছে।

নিজে এডভার্ট এবং বন্ধু অগস্ট দুইজনই ফিরির ঝোলা কাঁধে নিয়ে পথে পথে ঘোরে। দোকানে যত বিক্রিই হোক, সে-বিক্রিতে লভ্যাংশ কম। পথের বিক্রি আলাদা জিনিস। সেখানে লোকে জিনিস পেলেই স্বর্গ হাতে পায়। যতক্ষণ পকেটে পয়সা আছে, ততক্ষণ দিতে কার্পণ্য করে না।

মাল-কেনার মহাজন নানা জায়গাতেই আছে এডভার্টের। সৎ লোক বলে ওর খ্যাতি আছে সর্বত্র। সে-সব আড়তে ওকে মাঝে মাঝে যেতে হয়। উত্তরে লোফোটেন, দক্ষিণে ফোসেনল্যাণ্ড, বছরে অন্ততঃ চার বার ওর না গেলে চলে না।

সেবারে যখন ফোসেনে এলো এডভার্ট, কেনফ বললেন—"তোমার সেই বন্ধু কি এখনো তোমার সঙ্গেই আছে? থাকে যদি, ডকটা দেখে যেতে বোলো।" ও-ডক গড়ে তোলার পরিকল্পনা যে একসময় অগস্টই দিয়েছিল, তা অবশ্য তিনি বললেন না।

পল্‌ডেনে ফিরে গিয়ে অগস্টকে ঐ কথা বলতেই সে চঞ্চল হয়ে উঠল। হাজার হলেও মানুষ সে ভবঘুরে। পল্‌ডেনে শান্তিসুখ যতই থাকুক, চাঞ্চল্য আর উত্তেজনার তো অভাব রয়েছেই। "আসি ডকটা দেখে"—বলে সে বিদায় নিল এডভার্টের কাছে।

এডভার্টের অবশ্য তখনই সন্দেহ হলো যে অগস্ট আর আসবে না। কিন্তু সন্দেহ যতই হোক, ওকে নিষেধ করবার সে কে? আর, ফোসেনল্যাণ্ডও অবশ্য এডভার্টের কাছে ঘরবাড়ী। চাকরি করার কালে যেটুকু খাতির সে কেনফের কাছে পেতো, এখন তার চেয়ে ঢের বেশী পায়। পায় এই কারণে যে এডভার্ট আর কৃপার প্রার্থী

নয় কেনফের। অল্পের মধ্যে সে এখন বেশ সচ্ছল অবস্থার লোক। তা ছাড়া রোমিওর খুব ভাল ধারণা তার সম্বন্ধে।

হ্যাঁ, ফোসেন জায়গাটি ঘরবাড়ীরই মত এডভার্টের কাছে। এখানে যদি ঘাঁটি হয়ে থেকেই যায় অগস্ট, এডভার্টের চোখের উপরেই রইল। পল্‌ডেনে ফিরে গিয়েই সে অগস্টকে বলেছিল কেনফের আমন্ত্রণের কথা। তার পরই, কয়েক দিনের মধ্যেই অগস্ট পা বাড়িয়ে দিল ফোসেনের দিকে। এডভার্ট বলেছিল নৌকো নিয়ে যেতে। অগস্ট নাক সিঁটকে জবাব দিয়েছিল—"জাহাজ দিতে পারতিস তো নিতাম। নৌকা কিছু না। ওতে উঠলেই গা গুলোয় আমার।"

যথাকালে খবর পেলো এডভার্ট। কেনফ লুফে নিয়েছেন অগস্টকে। ডকের ম্যানেজার করে দিয়েছেন তাকে। সেই স্টিমার কোম্পানীটা, আর বেশীদিন গুমোর করে থাকা তার পক্ষে সম্ভব হলো না। যাত্রীরাই হৈ-চৈ শুরু করে দিল। "কাছেই অমন সুন্দর ডক, সেখানে ইস্টিমার না ভিড়িয়ে তোমরা মাছ-দরিয়ায় কেন নামাবে আমাদের?" অগত্যা কেনফের সঙ্গে একটা বন্দোবস্ত করল কোম্পানী। কেনফের এতদিনের সাধ পূর্ণ হলো।

এডভার্ট পল্‌ডেনে বসে খবর পায় সবই। চিঠি আসে। পল্‌ডেনে চিঠি আসে আজকাল। একটা ডাকঘর হয়েছে এখানে। কেরোলাসের বাড়ীতেই হয়েছে। কারণ সে হলো গ্রামের মোড়ল। বাড়তি ঘরও আছে তার বাড়ীতে। তবে পোস্টমাস্টারি করার মত বিদ্যে নেই কেরোলাসের পেটে। নেই তা এডভার্টেরও। কেরোলাস জামিন হয়ে কাজটা জোয়াকিমকে পাইয়ে দিল। অবশ্য কেরোলাসের কাছে জোয়াকিমের জামিন আবার এডভার্ট। ডাকঘর যখন, পয়সাকড়িও লেনদেন হবে তার মারফৎ! জামিন না হলে চলবে কেন?

পোস্ট অফিস খুলবার কয়েকদিন পরে একখানা চিঠি এলো এডভার্টেরই নামে। ফোসেনে কেনফদের ঠিকানায় এসেছিল এ-চিঠি।

সেখান থেকে রোমিও ঠিকানা কেটে পল্ডেনে পাঠিয়েছে। ডাকঘরের কাজ শেষ করে জোয়াকিম যখন বাড়ী এলো সেদিন, সে এনে এডভার্টের হাতে দিল। কেনফদের কাছ থেকে আসছে যখন, দেনা-পাওনার চিঠিই হবে বলে ধারণা জোয়াকিমের।

জীবনে আজই প্রথম আফশোষ হলো এডভার্টের, কেন লেখাপড়াটা সে ভাল করে শিখতে পারেনি! এত কষ্ট হচ্ছে চিঠিখানি পড়তে! অথচ না পড়লে নয়। ভাল করেই পড়তে হবে। কারণ চিঠির শেষে নামটা বড় হরফে লেখা। সে-নাম হলো মারগ্রেটা লেভিসা!

মারগ্রেটা? এতদিন পরে মারগ্রেটা? কোথায় মারগ্রেটা?

আমেরিকায়! এই যে যুক্তরাষ্ট্রের কোন্-একঘরের ছাপ। তারিখটা পড়া যাচ্ছে। মাস তিনেক আগের ছাপ। উঃ! এতদিন লাগল?

অনেক কষ্টে পড়ল চিঠি এডভার্ট।

"প্রিয় মিস্টার এ্যাণ্ড্রিয়াসেন।

আমাকে মনে আছে কি? আমরা ভালই আছি এদেশে এসে। তবে থাকব না আর। হাকন আমাকে আর মার্জিকে রেখে সুদূর পশ্চিমে চলে গিয়েছে। সেখানে নাকি চটপট বড়লোক হওয়ার সুযোগ এখানকার চেয়েও অনেক বেশী। তবে সেখানে মেয়েদের থাকার মত জায়গা নেই বলে আমাদের সঙ্গে নেয়নি। তার চেয়েও যা বড় কথা, যাওয়ার আগে বিবাহ-বিচ্ছেদ করে আমাকে মুক্তি দিয়ে গিয়েছে। আমার আর ভাল লাগছে না এখানে, নিজের দেশে ফিরে যাব ভাবছি। দেশে অবশ্য আমার আর ঘরবাড়ী নেই। তবু নিজেরই দেশ তো! যাচ্ছি, একটা আশ্রয় কি আর জুটবে না? যত শীঘ্র পারি, চলে আসছি। মার্জি এখন বড় হয়েছে অনেকটা। তবু আপনাকে ভোলেনি।" ইতি—

মারগ্রেটা লেভিসা।

অনেক চেষ্টায়, অন্ততঃ চারবার পড়ার পরে, চিঠিখানার মর্ম মাথায় ঢুকল এডভার্টের। সেই মারগ্রেটা। সে চিঠি লিখেছে। সে বন্ধন-মুক্ত এখন। সে ফিরে আসছে। তার বাড়ী-ঘর আর নেই। তবু

একটা-না-একটা আশ্রয় পাবেই এ-দেশে এলে। এ-ভরসা তার আছে।

আহাহা! একটা-না-একটা আশ্রয়! সে জানে না যে তার নিজের বাড়ী এখনো তারই বাড়ী আছে, সে চলে যাওয়ার পরে জনপ্রাণী ঢোকেনি সে-বাড়ীতে। ফোসেন থেকে বার বার ফিরে এসেছে এডভার্ট। তিন ঘণ্টার বিজন গিরিপথের ও-মাথায় যে ডোপেন খামার জঙ্গল হয়ে পড়ে আছে, সেখানে সে একবারও যায়নি। পারেনি যেতে। মারগ্রেটা-হীন ডোপেনের হাওয়ায় নিশ্বাস নিতেই সে পারবে না হয়ত, এই ভয়েতেই যেতে পারেনি সে।

আজ—?

হায় রে! কত কথা মনে হয়, গুছিয়ে লিখবার বিদ্যে নেই এডভার্টের। অনেক ভেবে, অনেক দ্বিধার পরে বোন পলিনকে সে ডাকল। ভাই জোয়াকিমকে নয়, বোন পলিনকে।

"এই মহিলা, বাড়ীটা আমায় উনি গছিয়ে গিয়েছিলেন আমেরিকায় যাওয়ার সময়। পড়ে আছে। খদ্দের পেলে নিশ্চয় বেচে দিতাম। কিন্তু কোথায় খদ্দের? আমার মত বোকা গাধা তো দুনিয়ায় আর একটিও নেই! খদ্দের জোটেনি! পড়ে আছে বাড়ী। তিনি যদি ফিরে আসেন, বহুত আচ্ছা। পড়ে আছে, তিনি যদি এসে বাস করেন, সে তো বহুত আচ্ছা। লিখে দে তাই। বেশ মোলায়েম করে লিখে দে। যাতে তিনি মনে করতে না পারেন যে আমি বড়মানুষি ফলাচ্ছি। আর, কেনাবেচা পয়সাকড়ি, এসবের কথা একদম লিখবি না। এমনি ভাব দেখাবি—হাঃ হাঃ হাঃ—যেন—হাঃ হাঃ হাঃ—তিনি ফিরে এলে আমি বর্তে যাই—হাঃ হাঃ হাঃ—"

পলিন চালাক মেয়ে। সে লক্ষ্য করল যে বড়দার হাঃ হাঃ হাঃ আজ হাসির মত শোনাচ্ছে না মোটেই। শোনাচ্ছে হাহাকারের মত। সে যা বুঝল, তাই লিখে দিল চিঠিতে। "কী লিখলি?"—যখন জিজ্ঞাসা করল এডভার্ট, তখন ঘাড় দুলিয়ে বলল—"ঠিকই লিখেছি।

পড়ে শোনাতে লজ্জা করবে আমার। তুমি বাপু নিশ্চিন্দি থাকো। যা লিখলে কাজ হবে, লিখেছি ঠিক তাই।"

চিঠি এডভার্টের সামনে রেখে দিয়ে সে ছুটে পালিয়ে গেল।

এডভার্ট চেষ্টা করল পড়তে। একবারে না হোক, তিনবারের চেষ্টাতেও অন্ততঃ মোটামুটি পড়ে উঠতে পারত বোধ হয়, কিন্তু পারলই না পড়তে। চোখ জলে ভ'রে আসে, দৃষ্টি হয়ে আসে ঝাপসা।

যেমনকার দোকান, তেমনি রইল। "মাল আনতে যাচ্ছি"—বাবাকে শুধু একটি কথা বলে নৌকা ছেড়ে দিল এডভার্ট।

* * *

দীর্ঘ প্রতীক্ষা। প্রতি বৃহস্পতিবার কোপেনহেগেন থেকে ইস্টিমার আসে এদিকে। আমেরিকার যাত্রী কেউ এলে, ফোসেনে নামবে ঐ ইস্টিমার থেকেই। অগস্ট আছে ডকে। তাকে বলে রেখেছে এডভার্ট। "ডোপেনে যদি যেতে চায় কোন যাত্রী, আর দৈবাৎ যদি আমি সেদিন আসতে না-ই পারি এখানে, তুই তাকে যত্ন করে পাঠিয়ে দিবি।"

ধূর্ত-অগস্ট বলল—"যাত্রী? না, যাত্রিণী? যাত্রী বলতে তো আমি পুরুষ মানুষ বুঝি। তাকে যত্ন করে পাঠাতে হবে, এর মানেটা কী বৎস? সোজা পাহাড়ে পাহাড়ে হেঁটে চলে যাবে, আমার যত্ন তার দরকার হবে কেন?"

একথার কোন উত্তর পেলো না অগস্ট।

আর, অগস্টের উপরে নির্ভর করে সত্যি সত্যি বসেও নেই এডভার্ট। ঝড় হোক, শিলা পড়ুক, বৃহস্পতিবার সকালে সে হাজিরা দেবেই ফোসেনের ডকে। প্রতি হপ্তাতেই। ইস্টিমার আসে। কোন হপ্তায় দুই একজন ফিরে আসে বইকি আমেরিকা-প্রবাসী। কিন্তু যার আসার আশায় এডভার্ট ধর্না দিচ্ছে ফোসেনে প্রতি বৃহস্পতিবারে, সে তো এলো না এখনো! তবে কি বৃথা এত তোড়জোড়? এত সযত্নে বরণডালা সাজানো?

এডভার্ট তোড়জোড় কম করেনি সত্যি। ছয় বছর পরে সেদিন

যখন ডোপেনে ঢুকল সে, খামার দেখল জঙ্গলে আচ্ছন্ন, ঘরগুলো প্রায় ভূমিসাৎ। আজ তিনমাস ধরে সে ভূতের মত খেটেছে, জলের মত পয়সা খরচ করেছে, আগের দিনের সেই শ্রীছাঁদ ফিরিয়ে আনবার জন্য। ঘরগুলো প্রায় নতুনই করে ফেলেছে বলতে গেলে। কাঠ মেরে, গজাল ঠুকে, জানালায় নতুন কাচ আর ছাদে নতুন চাপড়া বসিয়ে, তারপর নতুন রং লাগিয়েছে ভিতরে বাইরে। বাগানে একটি আগাছা নেই। জমিতে একখানি পাথর নেই। পড়শী কারেলের লাঙ্গল ঘোড়া চেয়ে এনে দু'খানা ভুঁই চষেও ফেলেছে এরই মধ্যে। বীজ এনে রেখেছে ঘরে, মারগ্রেটা এলে তাকে দিয়েই ছড়িয়ে দেবে বলে।

কিন্তু সে তো আসে না?

রোজ বৃহস্পতিবারে আসে ডোপেন থেকে, অগস্টের সঙ্গে গল্পগুজব করে। তারপর ইস্টিমার যখন আসে, অগস্ট ছুটে চলে যায় কাপ্তেনের কাছ থেকে মালপত্র বুঝে নিতে, আর এডভার্ট এদিক ওদিক খানিক তাকায়। তারপর একটা নিশ্বাস ফেলে ফিরে যায় দোকানের দিকে। সেখানে ম্যাগনাসের হাতে একটা ফর্দ দেওয়া আছে। মাল বুঝে নিয়ে নৌকায় উঠবে গিয়ে।

'আজ কিন্তু, আমেরিকা থেকে আসছে ওরা? ঐ যে মহিলা আর ঐ বালিকা? না, বোধ হয়। আমেরিকা থেকে যারা আসে, তাদের অত সাজ-পোশাকের পারিপাট্য থাকে না। যারা আসছে, তারা তো সেখানে খেতে পায়নি বলেই আসছে! সুতরাং তাদের বেশভূষায় চাকচিক্য থাকার তো কথাই নয়! সে-বিচারে ঐ মহিলা আর ঐ বালিকা—মেয়েটির তো সাটিনেরই ফ্রক!

অগস্ট ডাকছে হৈ-হৈ করে। এডলি! এডলি! এদিকে! এদিকে!

এডভার্ট জেগে আছে? না, স্বপ্ন দেখছে?' এই সুবেশা হাস্যমুখী মহিলাই তাহলে মারগ্রেটা? তা যদি হয়, তাহলে এটাই ধরে নিতে হয় যে তার ফিরে আসার কারণ আর যা-ই হোক, এমনটা কখনোই নয় যে সে খেতে পায়নি আমেরিকায়।

"মার্জ্জি, তোর কাকা! চিনতে পারিস? আমি এখন কোথায় যাব এডলি?"

এডভার্ট বলল—"তোমার বাড়ী।"

"কিসে যাব?"

"তোমার নৌকা আছে তো!"

সমাপ্ত